بسم الله الرحمن الرحيم

কারবালার শিক্ষা

মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনী
প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস
জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া
লালবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
৫৯, চকবাজার, ১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ্
হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর দারাজাত
বুলন্দের উদ্দেশ্যে-

যিনি কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র
রওযা মুবারককে সামনে রেখে বাংলার যমীনে
খেলাফত প্রতিষ্ঠার বজ্র শপথ নিয়ে
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত
নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত
রেখেছিলেন।

ফজলুল হক আমিনী

প্রকাশকের কথা

প্রকাশনার জগতে 'কারবালার শিক্ষা' যেমন একটি নতুন সংযোজন, একটি নতুন নাম এবং একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ, 'ইসলামী গবেষণা সেন্টার বাংলাদেশ' ও একটি নতুন সংস্থা, একটি নতুন উদ্যোম। এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এর শুভযাত্রা। সম্প্রতিকালের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিপথগামীতা ও ইসলাম বিদ্বেষী প্রকাশনার উম্মাদনা প্রতিরোধে একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ। নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী কার্য্যক্রম সুদূর প্রসারী, এর কর্মসূচী ব্যাপকভিত্তিক।

ইসলামকে সকল অপসংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করে গবেষণা ও সুশৃংখল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক প্রকাশ, ইসলামী তমদ্দুনের চেতনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ এবং গবেষণালব্ধ তথ্যবহুল রচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ইসলামী তাহযীবের পূর্ণতা অর্জন এ প্রকাশনী অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে হিসাবে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে অন্যান্য সব কিছুর সক্রিয় পরিকল্পনা হাতে নিয়েই আমরা প্রথমে পাঠকদের উপহার দিচ্ছি তথ্যবহুল ও অমর চেতনার ধারক একটি অবশ্য পাঠ্য রচনা 'কারবালার শিক্ষা'।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নয়নমণি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অধ্যায়।

এ ঘটনায় শুধু বিশ্ব মুসলিমই নয়, অমুসলিম সম্প্রদায়ের পাথরসম হৃদয়কোণেও সমবেদনার কম্পন জাগিয়েছে। আকাশের ফেরেশ্‌তা থেকে শুরু করে বেহেশ্‌তের হুর-পরীসহ পৃথিবীর প্রাণী জগতের প্রতিটি সদস্যের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে মহামানবকে উদ্দেশ্য করে এই পৃথিবীর সৃষ্টি, যাঁর আগমন হবে বলেই দুনিয়া ও আখেরাতের এ বিপুল আয়োজন, মস্ত বড় এ পৃথিবীর প্রাণী ও জড়জগত যাঁর শোকর গুজারী করে অহর্ণিষ, সেই জগৎপ্রিয় বিশ্ব নবীর এত আদরের পাত্র, কলিজার টুকরার এমন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র সৃষ্টি জগতের এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। না হওয়াটাই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল।

ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষায় ঐতিহাসিকগণ বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায়ও এ ঘটনার উপর কলম চালিয়েছেন অনেক স্বনামধন্য লেখক ও সাহিত্যিক। কিন্তু

পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ লেখক এ ঘটনাকে ইতিহাসের নীরিখে রচনা না করে আজবগল্প ও রূপকথার কাহিনীর মত সাজাতে গিয়ে ভাষা ও সাহিত্যের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে প্রকৃত ইতিহাসের বিকৃতি সাধনের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন বড় চতুরতার সাথে। আর এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টার উদ্ভব নতুন করে সৃষ্টি হয়নি। তা শুরু হয়েছিল ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই। ইসলামকে যারা বাঁকা চোখে দেখতে অভ্যস্ত, সেইসব জাতশত্রুরা অত্যন্ত চতুরতার সাথেই এ কাজটি আনজাম দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। তারা মহামনিষীদের জীবন চরিত্রে এমনসব ভিত্তিহীন বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, যার ফলে তাঁদের বিশুদ্ধতম জীবন ইতিহাস উদ্ধার করা সত্যান্বেষীদের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত কঠিন এক কাজ। আর তাদের এ কুচক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আমাদের অনেক সহজ সরল লেখকও কলম চালাতে গিয়ে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন নিজেদের অজান্তে। যে কারণে অনেক লেখকের লিখনীতে শত্রুদের পরিবেশিত ভুল তথ্যাদিরও সমাবেশ দেখা যায় প্রচুর।

বিগত ১৪০৭ হিজরী সনের ৮ই মুহররম দিবাগত রাতে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনী পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে মাদ্রাসার হাদীসকক্ষে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তাঁরই শাগরিদ মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যেব একত্রিত করে পাঠক সমাজের সামনে হাজির করে দিয়েছে।

এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি দিলে বইটি যদিও আরো আগেই প্রকাশ করা ছিল বাঞ্চনীয়। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার ভারে আজ অব্দি তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এর প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী তার পদক্ষেপ জাতির সামনে উপস্থাপন করার সাহস দেখিয়েছে। পুস্তকখানায় কারবালার প্রকৃত ঘটনা, বর্তমান যুব সমাজের করণীয় কাজ এবং এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ মাত্রই ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, এ পুস্তিকায়ও ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠক সমাজের সুদৃষ্টি থাকলে পরবর্তীতে আমরা তা সংশোধন করার আশা রাখি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের শ্রমকে স্বার্থক করে এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবূল করুন। এটাই আমাদের একামাত্র কাম্য।

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

প্রসংগ কথা

প্রশংসা যত শুধু আল্লাহ'র জন্যেই নিবেদিত। যিনি সৃষ্টি লগ্নেই মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় করেছেন সম্মানিত। তাদের দেখিয়েছেন সীরাতে মুস্তাকীম বা সহজ, সরল, সঠিক চলার পথ এবং যিনি যুগ থেকে যুগান্তরে সেই পথের দুর্জয় সাহসী সংগ্রামী সৈনিকদের মদদ যুগিয়েছেন পদে পদে।

রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক খাতামুন্ নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র উপর। যাঁর নিরলস সংগ্রাম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে একটি ঘৃণ্য জাতি পেয়েছিল মর্যাদার সর্বোচ্চ আসন। রহমত নাযিল হোক তাঁর সুযোগ্য সাহাবী ও পরিবার-পরিজনের উপর, যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর নিঃস্বার্থ কুরবানীর বদৌলতে আজ আমরা নিজেদের মুসলমান পরিচয়ে গর্ববোধ করতে পারি।

কিছু কিছু অতীত থাকে, যার কারণে ইতিহাস হয়ে উঠে সমৃদ্ধ ও ঘটনাবহুল। সে সবের মাঝে কালবালার ঘটনাও সেই বিশেষত্বের সত্যিকার দাবীদার। কারবালার ইতিহাস আজ মুসলিম জাহানের প্রতিটি ঘরে ঘরে মানুষের মুখে মুখে চর্চিত হলেও সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক নামীদামী জনেরাও এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ভ্রান্তির বেড়াজালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন। আজ আলেম সমাজের প্রয়োজন সঠিক ইতিহাস মানুষের সামনে উপযোগ্য করে তুলে ধরা। সময়ের এই তীব্র অনুভূতিই মূলতঃ আমাকে এ ক্ষেত্রে সামান্য পদক্ষেপ নেয়ার সাহস ও মদদ যুগিয়েছে।

'কারবালার শিক্ষা' নামক পুস্তিকাটি প্রকৃত পক্ষে আমার নিজস্ব কোন লেখা নয়; বরং ১৯৮৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৪০৭ হিজরীর ৮ই মুহররম লালবাগ মাদ্রসার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে আমি যে আলোচনা করেছিলাম, এটি তারই অংশ বিশেষ। সে আলোচনাকেই আমার একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যেব অক্লান্ত মেহনত ও পরিশ্রম করে বই আকারে পাঠক সমাজের সামনে হাজির করার হিম্মত দেখিয়েছে এই প্রচেষ্টার সুফল আল্লাহ তাকে দান করুন। আমি বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে যথাসম্ভব সংশোধন এবং প্রয়োজনের নিরিখে কিছু কথা সংযোজনও করে দিয়েছি।

কারবালার এই হৃদয় বিদারক, মর্মস্পর্ষী ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ কি ছিল, এ সম্পর্কে মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন–

'হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শহীদী আত্মা এখনও চিরন্তর সত্যের কণ্ঠ নিয়ে পৃথিবীর বুকে গর্জে উঠছে, বিশ্ব মুসলিমকে আহ্‌বান জানাচ্ছে এ পথের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ পথে অগ্রসর হয়ে ছিলেন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'? কিসের তাড়নায় প্রথমে মদীনা থেকে মক্কা, অতঃপর মক্কা থেকে কূফা হিযরত করলেন তিনি? কেনই বা নিজেকে স্বপরিবারে আল্লাহ'র রাহে উৎসর্গ করার মানসিকতা তাঁর মাঝে জেগে উঠেছিল?

নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ত্যাগ ও কুরাবানীর একমাত্র উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহই ছিল–

এক ঃ কুরআন সুন্নাহ'র সংবিধান সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

দুই ঃ ইসলামী দণ্ডবিধি নতুন করে পূর্ণাঙ্গভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত করা।

তিন ঃ রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে খেলাফত আ'লা মিনহাযিন্ নবুয়্যতের ভিতকে মজবুত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা।

চার ঃ সত্যের সংগ্রামে স্বীয় জীবন, ঐশ্বর্য্য এবং ছেলে সন্তানের মায়া-মমতা কাটিয়ে জীবন উৎসর্গ করা।

পাঁচ ঃ ক্ষমতার দাপটের মুখে সত্যের পথে চির সংগ্রামী বীর মুজাহিদগণ যেন নিষ্প্রভ হয়ে না যায়, তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

ছয় ঃ কারো হুংকারে ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে দুঃখে কষ্টে আল্লাহ'কে স্মরণ রাখা এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সর্বাবস্থায় তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।'

অতঃপর মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি আবেগঝরা ভাষায় তিনি বলেন–

'আমাদের সমাজে কি এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটবে না যে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নয়নমণি, কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে শাহাদাতের শরাব পানকারী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আহ্বানে সাড়া দিবে, আর তাঁর উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মকে স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিবে?

প্রভু হে! আমাদের হৃদয়ে আপনি আপনার রাসূল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র, তাঁর সুযোগ্য সাহাবায়ে কেরামের ও পবিত্র আহলে বাইতের খাঁটী প্রেম ও নিঃস্বার্থ মুহাব্বত ঢেলে দিন এবং দুর্জয় কদমে যেন তাঁদের পথে চলতে পারি, সে তাওফীক আপনি আমাদের দান করুন। আমীন।' [১]

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মর্মান্তিক শাহাদাতের বাস্তবতাকে সামনে রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনে যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ ও সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে জেহাদী জযবা সৃষ্টি করে দিন। বিশেষতঃ আজকের মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্যের নবদীক্ষিত স্বাধীনচেতা যুব সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণের পথ পরিহার করে 'সায়্যেদু শাবাবি আহ্লিল জান্নাহ্' হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রদর্শিত পথ অনুসণের রাস্তা সুগম করে দিন এবং কবির এ পংক্তির পরিপূর্ণ প্রতিফলন আমাদের ভিতর ঘটান–

تیری شباب امانت ہے ساری دنیا کی

توخار زار جہاں میں گلاب پیداکر

'গচ্ছিত আমানত তোমার এই যৌবন, সারা পৃথিবীর
হে ক্ষীণ দূর্বল! সৃষ্টি কর জগত তরে শান্তির নীড়।'

ফজলুল হক আমিনী
তাং- ২৫/৬/৯২ইং

১। শহীদের কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা– ৬০৭। ১১০-১১১

পাঠ নির্দেশনা

আশুরার তত্বকথা

হিজরী সনের সর্ব প্রথম মাস মুহররম। এ মাসের গুরুত্ব অন্যান্য মাস থেকে আলাদা। বিশেষতঃ আশুরা অর্থাৎ ১০ই মুহররম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময় একটি দিন। পবিত্র মাহে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে উম্মতের উপর এদিনের রোযা ছিল ফরয। রমযানের রোযা ফরয হওয়ায় পর এই রোযা নফলে পরিণত হয়। (১)

হাদীস শরীফের বর্ণনামতে এ দিবসে রোযা রাখা নফল হওয়া সত্ত্বও এর গুরুত্ব কমে যায়নি বিন্দুমাত্র। যদি কোন ব্যক্তি এ দিন রোযা রাখে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ব ও পরবর্তী পূর্ণ এক বৎসরের গুনাহ্ মাফ করে দেন। (২) আর কেউ যদি এ দিবসে নিজ পরিবার-পরিবর্গের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করে, আল্লাহ তা'আলা পুরো বৎসরের জন্য তার রুজী রোজগারে বরকত দান করেন। (৩)

আশুরার পবিত্র দিবসটি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কারণেই শুধু তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বের আসন পায়নি। বরং মানব ইতিহাসে বহু তাৎপর্যবহ ও পুণ্যময় ঘটনা জড়িয়ে আছে এ দিনটির সাথে। এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা কবূল করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামে'র উপর নমরূদ কর্তৃক প্রজ্জলিত ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডকে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হওয়ার নির্দেশ

---

(১) বুখারী শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮
(২) মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা - ১৭৯, মুসলিম শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৭৮/৩৭৯
(৩) ফতওয়ায়ে রহীমিয়া, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৩৮০

দিয়েছিলেন। এদিনেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা 'আলাইহিস্ সালাম'কে স্ব-জাতি বনী ইসরাঈলসহ ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নাজাত দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনায় চলে আসার পর মদীনার ইহুদীদের এ দিনে রোযা রাখতে দেখে প্রশ্ন করলেন– 'তোমরা এ দিবসে কিসের রোযা রাখ? তদুত্তরে ইহুদীরা জানাল– 'আমাদের প্রিয় নবী হযরত মূসা 'আলাইহিস্ সালাম' এবং তাঁর উম্মত বনী ইসরাঈল এ দিবসেই ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, আর এ দিনেই ফেরাউন স্ব-দলবলে লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিল। নিমজ্জিত হয়ে ইহধামে বাদশাহী করার খায়েশ ফুরিয়েছিল চির জনমের জন্য। আমরা এর শোকর আদায়ের লক্ষ্যে এ দিনটিতে রোযা রেখে থাকি।

'এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বললেন– 'হযরত মূসা 'আলাইহিস্ সালামে'র অনুসরণের দাবীদার তোমাদের চেয়ে আমি বহুগুণে বেশী।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' নিজে আশুরার রোযা রাখেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। (১)

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, শুধুমাত্র কারবালার ঘটনার কারণেই এ দিবসটি তাৎপর্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেনি। বরং আল্লাহ পাক হযরত হুসাইন'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের জন্য এমন একটি মুবারক দিবস নির্বাচিত করেছেন, যে কারণে তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ দিনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সকলের নিকট দিবসটি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

১। বুখারী শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮
মুসলিম শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৭৮-৩৭৯
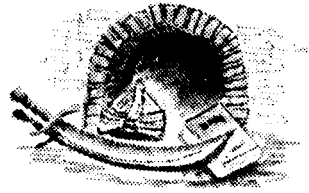
কারবালার পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক কথা

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে হুযূর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কত বেশী ভালবাসতেন, তার বর্ণনা মিলে বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে। শিশু হুসাইনের ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') কথাই ধরা যাক। কি গভীর সম্পর্ক ছিল নানাজীর সাথে।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' নামায আদায় করছেন, আর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মওকা খুঁজছেন নানাজীর সাথে একটু খেলাধূলা করার। এই সুযোগটি এসে যায় রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' যখন সিজদায় চলে যান। সিজদারত পেয়ে হুসাইন ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') চড়ে বসেন মহানবী 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র পৃষ্ঠদেশে। আর দয়ার সাগর মহানবী তখন নড়াচড়া করতেন না। মাথা উঠাতেন না সিজদা থেকে। শিশু হুসাইন ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেমে না আসা পর্যন্ত পড়ে থাকতেন তিনি সিজদায়। (১)

অন্য হাদীসে মহানবী 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এরশাদ করেন–

'হে প্রভু! আমি হুসাইনকে ভালবাসি, তুমি তাকে ভালবেস। আমার কলিজার টুকরা হুসাইনকে যারা ভালবাসবে, তাদেরও তুমি ভালবেস।' (২)

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ভালবাসতে গিয়ে ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থি কোন কাজে জড়িয়ে যাওয়াকে হুযূর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বৈধতার সনদ দিয়েছেন।

১। সিয়ারুস সাহাবা, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ৪২

২। ইবনে মাজাহ শরীফ, পৃষ্ঠা - ১৩, তিরমিযী শরীফ, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২১৮

বড় আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আজকাল শিয়াদের চক্রান্তের থাবা থেকে বিশ্ব মুসলিম মুক্ত হতে পারছে না। মুসলিম মিল্লাত শিয়াদের তাজিয়া মিছিলে শরীক হয়ে নিজেদের ঈমান আক্বীদা নষ্ট করছে। 'ইসলামের দৃষ্টিতে যেমনিভাবে তাজিয়া মিছিল বের করা, মাতম করা অবৈধ, তেমনি এ সকল কাজকর্ম দর্শনের জন্য রাস্তাঘাটে ভীড় জমানও নিষিদ্ধ।' (১)

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানূতূবী (রঃ) বলেন–

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কতিপয় উলামায়ে কেরাম আশুরার দিনে হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র জীবন চরিতের উপর আলোচনাকে শরীয়ত সম্মত মনে করে এ ধরনের আলোচনায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। আবার কতিপয় উলামায়ে কেরাম তাকে শরীয়ত বিরোধী মনে করে এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান বর্জন করে থাকেন এবং অন্যদেরকেও বর্জন করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে উভয় দলের অভিমত স্ব-স্ব স্থানে সঠিক। তা বুঝার জন্য একটি উদাহরণ আমাদের সামনে থাকলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন একই ঔষধ কিংবা একই খাদ্যের ভিতর বিভিন্ন প্রকার কার্যকারিতার সামাবেশ দেখা যায়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার ব্যবহারেও পরিবর্তন আসে এবং কার্যকারিতার মাঝেও দেখা যায় বিভিন্নতা। কোন রুগীর জন্য একটি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। আবার একই রোগে আক্রান্ত অন্য রুগীর জন্য এ ঔষধটিই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

যেমন কোন ডাক্তার কোন রুগীকে একটি প্রেসক্রিপশন দিলেন, অথচ অন্য এক ডাক্তার একই রোগে আক্রান্ত অন্য রুগীকে দিয়েছেন ভিন্ন প্রেসক্রিপশন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এখানে ডাক্তারদ্বয়ের প্রেসক্রিপশনের ভিন্নতা সুস্পষ্ট, তথাপি জ্ঞানীজন তাকে কখনো ডাক্তারের অপরিপক্কতা হিসাবে গণ্য করবেন না; বরং রোগ ও স্থানের ভিন্নতার কারণে প্রেসক্রিপশনের পরিবর্তন মনে করে তাকে গ্রহণ করবেন।

---

(১) ফত্ওয়ায়ে দারুল উলুম -হযরত মুফ্তী শফী (রহঃ), খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫৯-৬০

ঠিক তেমনি যে সকল উলামায়ে কেরাম হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র জীবন চরিত আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করে এধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মানুষকে এ কথা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, খাঁটী দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে জীবনের উপর মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যে কোন প্রতিকুল অবস্থার মুকাবেলা করতে হবে এবং নিজেকে পাহাড়সম দৃঢ় ও স্থির রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই নিজের ভিতর সামান্যতম দূর্বলতা ও হীনমন্যতা সৃষ্টি করা যাবে না।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' জীবনের উপর মৃত্যুর চরম ঝুঁকি নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে, জান-মাল, পরিবার-পরিজন, ক্ষুধা-পিপাসা এমন কি স্বীয় সম্বলহীনতার প্রতিও কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে একমাত্র 'মাওলার রেযামন্দি'র উদ্দেশ্যে সবকিছু উৎসর্গ করে গেছেন। সুতরাং আমাদেরকেও জীবনের উপর চরম ঝুঁকি নিয়ে হলেও খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

আর যে সকল উলামায়ে কেরাম এ ধরনের আলোচনা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে, অন্যদেরকেও দূরে থাকতে পরামর্শ দেন, তাঁদের যুক্তি হল– এই দিনে এ ধরনের আলোচনার দ্বারা শুধুমাত্র শিয়াদের ভিত্তিহীন কর্মকাণ্ডের প্রচার হয়ে থাকে। সুতরাং এ ধরনের আলোচনার দ্বারা সমাজের সাধারণ মানুষের উপর কুপ্রভাবই বেশী বিস্তার লাভ করে। অথচ সাধারণ মানুষের সত্যমিথ্যা যাঁচাইয়ের যোগ্যতা বড় একটা থাকে না। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়াদের ভিতর ছোটখাট বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের বাস্তবতা সম্পর্কে তারা আদৌ জ্ঞাত নয়।

উপমা হিসেবে হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম' ও হযরত হারুন 'আলাইহিস সালামে'র পরস্পর অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং হযরত খিযির 'আলাইহিস সালাম' ও হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামে'র পরস্পর প্রশ্নোত্তর-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গুলো সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বিষয়। যার দর্শন ও হেকমত পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ এ সূক্ষ্ম জ্ঞানগুলোর মোটেও খবর রাখে না। এ জন্য তাদের সামনে এমন কোন বিষয়বস্তুর আলোচনা সমীচীন নয়, যার ফলে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের প্রতি তাদের বিরূপ

মনোভাব জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টির সনদ প্রদান করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

তাই তাঁদের জীবন চরিত আলোচনা করতে গিয়ে যদি মানুষের অন্তরে কারও সম্পর্কে সামান্যতম বিরূপ মনোভাব জন্ম নেয়, তবে নিঃসন্দেহে এটা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যা আদৌ কারো কাম্য হতে পারে না। অতএব তাঁদের মতে আশুরার দিনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা না করাই শ্রেয়।' (১)

যেহেতু আশুরার দিনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করার বা না করার পক্ষে ও বিপক্ষে অভিমত রয়েছে, তাই যদি কেউ এ বিষয়ের উপর আলোচনা করার মনোস্থীর করে, তবে তার এ আলোচনা হতে হবে একমাত্র ইক্বামাতে দ্বীনের লক্ষ্যে, জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে। এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করে যুব সমাজকে খোদার রাহে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করে যদি কোন সাহাবা সম্পর্কে করা হয় কটুক্তি, আনা হয় যদি তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এবং নির্বিচারে তাঁদের গালমন্দ করে অশ্রাব্য ভাষায় কটাক্ষ করা হয়। তবে তার জন্য এটা হবে মারাত্মক অন্যায়, যার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এরশাদ করেন–

'আমার ওফাতের পর আমার সাবাহাবাগণের পারস্পরিক মতানৈক্যের (ইখতেলাফের) কারণ জানতে চাইলাম আমার প্রতিপালকের কাছে, তিনি অহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিলেন– হে মুহাম্মদ! তোমার সাহাবারা আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তাদের মাঝে মর্যাদার ভিন্নতা রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আলোর দিক দিশারী। তাদের মতবিরোধপূর্ণ যে কোনদিক

---

(১) ফত্ওয়ায়ে রহীমিয়া, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৩৫৯-৩৬০

যে কেউ গ্রহণ করুক, আমার নিকট সে হেদায়াতের উপর রয়েছে।' রাসূল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলেন– 'আমার সাহাবাগণ তারকাতুল্য, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পেয়ে যাবে।' (১)

'সুপ্রসিদ্ধ তাব্‌য়ে তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে একবার প্রশ্ন করা হল– 'হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মাঝে উত্তম কে?' প্রশ্ন শোনামাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, ইতিপূর্বে তাঁকে এত রাগান্বিত হতে কেউ কোন দিন দেখেনি। তিনি বললেন– 'হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে তুলনা করছ তুমি ওমর বিন আব্দুল আযীযের (রহঃ)? খোদার শপথ! নবী করীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র সাথে জিহাদ করতে গিয়ে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ঘোড়ার নাকের ছিদ্র পথে ধূলির যে কণিকা প্রবেশ করেছে, সে কণিকা থেকে একটি কণিকা ওমর বিন আব্দুল আযীযের (রহঃ) তুলানায় শতগুণে উত্তম।' (২)

কিন্তু আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক বর্তমান, যারা না বুঝে ভ্রান্ত আক্বীদার সস্তা বই পাঠ করে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করে বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র। অথচ আকাবিরগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে মুখ খুলতেন।

---

(১) হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫-৬

(২) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (মূলগ্রন্থ) খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৩৯
হযরত মু'আবিয়া আওর তারিখী হাক্বায়েক্ব, পৃষ্ঠা - ২৩৮

কারবালার ঘটনার মূল্যায়ন

আমাদের সমাজে আরেকটি দলের সরব পদচারণা রয়েছে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তারা হযরাত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের কুরবানীর গুরুত্বকে স্বীকার করতে যেন কুণ্ঠাবোধ করেন। অথচ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কুরবানী নিয়ে তাদের ব্যতি-ব্যস্ততার অন্ত নেই। এ কথা ঠিক যে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করে গেছেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই বলে তো তিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সকল সাহাবাদের মর্যাদার আসন ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে যেতে পারেননি। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে কি কারবালার ঘটনার চেয়ে খাট করে দেখার অবকাশ রয়েছে? এরূপ ধারণা কিছুতেই স্বীকার করে নেয়া যায় না। বরং তা হবে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর আঘাতের শামিল। তায়েফের ময়দানে হযরত রাসূলে কারীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' দ্বীনের জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন, তার গুরুত্ব কি তারা স্বীকার না করে পারবেন? হযরত উসমান ও হযরত হামযা 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র শাহাদাতের করুণ ইতিহাস কি কারবালার ঘটনার চেয়ে কোন দিক থেকে কম গুরুত্বের দাবীদার?

তবে হ্যাঁ, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনুপম ব্যক্তিত্ব ও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শকে আঁকড়ে থাকা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এরশাদ করেছেন– 'তারা উভয়ই জান্নাতে যুব সম্প্রদায়ের সর্দার হবেন।' (১)

---

(১) তিরমিযী শরীফ, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২১৮

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র এই হাদীসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করি এবং তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে যথার্থ চেষ্টা চালাই, তবে আজকের দিকভ্রান্ত যুব সমাজের জন্য বিরাট দিক-নির্দেশনা খোঁজে পাব । কেননা অনেক যুবক ভাইদের মুখে আজকাল এ কথা বলতে শুনা যায় যে, 'ইসলাম যুব সমাজের সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়নি।' প্রকৃত অর্থে ইসলাম সম্পর্কে এটা তাদের ভুল ধারণা। ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন না করে তারা নিজেরা ভ্রান্ত ধারণা লালন করছে।

ইসলামের জন্য হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তা এক নজীরবিহীন অধ্যায়। আজ শুধু আমরা মুখে মুখে চর্চা করে বেড়াই যে, হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' আমাদের সর্দার। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এর কতটুকু বাস্তবতা আমরা রক্ষা করে চলতে পেরেছি? বলতে গেলে কোন ক্ষেত্রেই আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারছিনা। তাঁদেরকে সর্দার হিসাবে গ্রহণ করার দাবীর মূল্যায়ন শুধুমাত্র তখনই হবে, যখন আমরা পৃথিবীর বুকেও তাঁদের অনুসৃত নীতির পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারব ।

যুব সমাজ যদি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আত্মত্যাগী প্রেরণা নিয়ে নিজেদের খোদার রাহে উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে, নিজেদের বুকের তাজা রক্ত বিসর্জন দিয়ে তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে দুর্লংঘ বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাঙ্খিত লক্ষ্যকে এ যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে তাই হবে তাদের জন্য হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের সঠিক মূল্যায়ন, তবেই হবে এর যথার্থ মূল্য প্রদান। যুব সমাজের জন্য এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি হতে পারে?

আশুরার শিক্ষা তো এই নয় যে, দশ-ই মুহররম আসার সাথে সাথে ইসলামী আইন কানূনের প্রতি কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে পর্দাহীন অবস্থায় নারী পুরুষ একত্রে মাতম– মর্সিয়া করা, গান-বাজনা বাজিয়ে জনগণ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করা, তাজিয়া মিছিল বের করে ভক্তি প্রদর্শন করা, এবং কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে এ দিনটিকে উদ্‌যাপন করা

আশুরার এই পবিত্র দিনটিকে এমনি ভিত্তিহীন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে উদযাপন করা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনেরই নামান্তর হবে। উপরন্তু আমাদের এ ব্যবহারে কারবালার ময়দানে তাঁর শহীদী আত্মা শুধু কষ্টই পাবে।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র গৌরবদীপ্ত আত্মদান নিঃসন্দেহে পরবর্তীদের জন্য দিক-নির্দেশনার মাইলস্টোন হিসেবে এক অম্লান চিরন্তন আলোক বর্তিকার কাজ করবে। এই ত্যাগ ও আত্মদানের আদর্শ যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে প্রেরণা যুগিয়ে আসছে, আসবে। সেই অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর অনুসৃত নীতি ও আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে অন্যায়ের প্রতিরোধ ও 'আদ্ল-ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মত্যাগের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা। এ প্রসংগে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হার কারবালা কে বাদ।' প্রত্যেক কারবালার পর ইসালাম নবজীবন লাভ করে।

খেলাফতের মাসনাদে ইয়াযীদ হযরত হুসাইনের বিরোধিতা

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাঁর খেলাফতের ক্রান্তিলগ্নে এসে এ কথা তীব্রভাবে অনুধাবন করতে পারলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি খুবই নাজুক। চতুর্দিকে ফেতনার সায়লাবে পরিবেশ ক্রমেই অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বত্রই হতাশা ও নিরাশার থাবা বিস্তার করছে। মুসলমানদের ভিতর নেতৃত্বের প্রশ্নে বহু দ্বিধা-বিভক্তির সূত্রপাত ঘটেছে। তাই তিনি ইসলামী খেলাফতকে ভবিষ্যত হুমকীর কবল থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এবং মুসলমানদেরকে আপসে পুনরায় রক্তের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার মানসে একটি সুচিন্তিত সমাধান খুঁজে বের করে যাওয়া আপন কর্তব্য মনে করলেন।

তিনি তাঁর একান্ত সহযোগী ও সচিবদের নিয়ে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তাদের অনেকেই তাঁর সুযোগ্য সন্তান ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা

হিসেবে নিয়োগ করার অভিমত ব্যক্ত করলেন। অন্যদিকে কূফা থেকেও একটি প্রতিনিধিদল হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট এ প্রস্তাব নিয়ে আগমন করল– 'কূফাবাসীর হয়ে আমরা প্রস্তাব পেশ করছি যে, আপনি আপনার মৃত্যুর পর ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করে যাবেন।'

নিজের ছেলে ইয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'রও প্রথম দিকে কিছুটা সংশয় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করার বিভিন্ন প্রস্তাব আসা অব্যাহত থাকায়, তিনি সংশয় থেকে নিস্কৃতি লাভ করেন এবং ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এ ক্ষেত্রে তাঁকে স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের দোষে বিক্ষত করার সামান্যতম অবকাশ বা ক্ষীণতম সম্ভাবনাও থাকতে পারে না। কারণ ইতিপূর্বে ইয়াযীদের চরিত্রে কলংক লেপনের মত কোন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক যোগ্যতাও তার মাঝে ছিল পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।

পরিস্থিতির সর্বদিক লক্ষ্য রেখে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইসলামী রাষ্ট্রের সকল গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, এখন থেকেই যেন সর্বসাধারণ থেকে ইয়াযীদের নামে বাই'আত নেয়া হয়। নির্দেশ মুতাবেক সিরিয়া, ইরাক, কূফা এবং বসরার গভর্ণরগণ ইয়াযীদের নামে বাই'আত নিতে শুরু করলেন। (১)

ইতিমধ্যে এ কথা সর্বত্র প্রচার হয়ে গেল যে, ইয়াযীদকে সবাই খলীফা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন শুধুমাত্র হিযাযের মুসলমানদের স্বীকৃতি বাকী। তাই হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কা ও মদীনার গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করলেন, জনগণ থেকে ইয়াযীদের নামে বাই'আত নেয়ার জন্য। মক্কা এবং মদীনায় যখন ইয়াযীদের বাইয়া'তের কথা ঘোষণা করা হল, তখন সর্বসাধারণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হল। কারণ তাদের ধারণা ছিল হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পর

১। আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৪৯-২৫০-২৫১
শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ১১-১২

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'ই হলেন সর্বদিক থেকে খলীফা হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। তাই তারা ইয়াযীদের নামে বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকল। তারা হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমে'র ন্যায় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের মতামতের অপেক্ষায় রইল।

মদীনার গভর্ণর পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরে সকলকে একত্রিত করে এক ভাষণ দিয়ে ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'আমরা ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। সর্বসাধারণ যাকে খলীফা মনোনয়ন করবে, আমরা কেবল তার হাতেই বাই'আত গ্রহণ করব । ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হোক এটা আমরা কখনও মেনে নিতে পরি না।'

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে যখন এ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হল, তখন তিনি নিজে মদীনায় আগমন করে তাঁদেরকে এ বিষয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টাও ফলপ্রসু হল না। সকলেই তাঁর বিরোধিতা করলেন।

অতঃপর হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'র নিকট গেলেন। হযরত আয়েশা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা' প্রথমে তাঁকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করে বললেন– 'আমি শুনেছি আপনি তাঁদের থেকে জোরপূর্বক ইয়াযীদের স্বীকৃতি নিতে চান এবং তাঁদের নাকি হত্যার হুমকী দিচ্ছেন'?

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'এসব ভিত্তিহীন সংবাদ। তাঁরা সবাই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের আমি আন্তরিকভাবেই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা আমি আমার স্বীয় কর্তব্য বলে মনে করি। তবে কথা হল যে, 'শাম ও ইরাকসহ ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ ইয়াযীদের বাই'আতের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। তার খেলাফত

সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এখন বাকী শুধু এই কয়জন ব্যক্তি। তাঁরাই শুধু বিরোধিতা করছেন।'

হযরত আয়েশা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা' বললেন– 'এ ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝেন। তবে আমার পরামর্শ হল, আপনি তাঁদের সাথে জোর-জবরদস্তিমূলক কোন আচরণ করতে যাবেন না। নম্র, ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝাতে চেষ্টা করবেন।'

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত আয়েশা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'র এ পরামর্শ মেনে চলবেন বলে আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন। (১)

এদিকে হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মদীনায় অবস্থানের দ্বারা অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাঁদের উপর বল প্রয়োগ করা হবে। এ আশংকায় উভয়ই স্ব-পরিবারে মদীনা থেকে মক্কায় চলে গেলেন। এ ছাড়া অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে তখন মক্কায় অবস্থান করছেন।

বেশকিছু দিন মদীনায় অবস্থান করার পর হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'ও হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে হাজির হলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'কে পৃথক পৃথকভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাঁদেরকে রাজী করানো যাচ্ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'আপনার পূর্বে যাঁরা খলীফা ছিলেন, তাঁদেরও অনেক যোগ্য সন্তানাদি ছিল। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তারা ইয়াযীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ছিল, তবুও তাঁরা তাঁদের সন্তানদের এ দায়িত্বে বহাল করেননি। তাঁরা মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খেলাফতের দায়িত্ব অন্যের হাতে অর্পণ করে গেছেন। অথচ আপনি আপনার সন্তানের জন্য এ কাজটি করে যাচ্ছেন।'

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৫১-২৫২

এমনিভাবে প্রত্যেকের সাথে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মতবিনিময় হয় এবং সকলেই ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন।

সর্বোপরি হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' সহ আরও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পরামর্শ দেন– 'আপনি আমাদেরকে ইয়াযীদের হাতে বাই'আতের জন্য বল প্রয়োগ করবেন না। আমরা আপনার নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি; তার যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের সাথে আপনার অন্য কোন বিরোধ নেই।' প্রস্তাব তিনটি হলঃ

একঃ খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নীতি অনুসরণ করুন। অর্থাৎ আপনি কাউকে মনোনীত না করে সাধারণ মুসলমানদের উপর এ দায়িত্বভার ছেড়ে দিন। তারা যাকে ভাল মনে করেন, তিনিই মনোনীত হবেন সকলের 'আমীরুল মু'মিনীন।'

দুইঃ আপনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পন্থা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি এমন এক ব্যক্তির নাম পেশ করুন, যার সাথে আপনার বংশের কোন সম্পর্ক থাকবে না, থাকবে না আপনার আত্মীয়তার কোন বন্ধন এবং এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তার মাঝে পাওয়া যাবে।

তিনঃ আপনি ফারুকে আ'যম হযরত ওমর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পদ্ধতি অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি ছয়জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্বের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে যান, তাঁরাই নির্দ্ধারিণ করবেন পরবর্তী খলীফা কে হবেন। এ ছাড়া চতুর্থ আর কোন প্রস্তাব আমরা মানতে রাজী নই।'

কিন্তু হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তদুত্তরে বললেন– 'সারা মুসলিম বিশ্ব ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছে। এখন আপনাদের এ কয়জনের বিরোধিতার পরিণাম মুসলমানদের জন্য আদৌ কল্যাণকর হবে না। এ পরিস্থিতিতে সকলেরই উচিত, ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা।'

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খেলাফতকালে পরিস্থিতি আর ঘোলাটে হওয়ার সুযোগ পায়নি। মুসলমানদের পরস্পর মতভেদ এড়ানোর জন্য সিরিয়া ও ইরাকের পর মুসলিম জনতার আরও একটি বৃহদাংশ ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনা অধিবাসীগণ বিশেষতঃ হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম' ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। তাঁরা কারও ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন– 'ইয়াযীদ কোন অবস্থাতেই খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার যোগ্য নয়।'

এই অমীমাংসিত পরিস্থিতির ভিতর হিজরী ৬০ সনে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইন্তেকাল করেন। হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকালের পর ইয়াযীদ খেলাফতের মাসনাদে সমাসীন হয়। মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইয়াযীদকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করে যান। তার ভিতর একটি ছিল– 'আমার ধারণা হচ্ছে কূফাবাসী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে তোমার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাবে। যদি তুমি তাঁর সাথে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হও, তবে তাঁর সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করবে না। পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র পবিত্র রক্তের সম্পর্কের কারণে তাঁকে পূর্ণ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে। কেননা, মুসলমানদের উপর তাঁর দাবী অনেক বেশী।'(১)

১। শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ১২-১৭

আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৫৯

মক্কার পথে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'

ইয়াযীদ খেলাফতের মাসনাদে বসেই মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ ইবনে উত্‌বার নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করল– কালবিলম্ব না করে হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম' থেকে খেলাফতের বাই'আত নেয়া হোক। সহজে তাঁরা রাজী না হলে প্রয়োজনবোধে যে কোন পন্থা অবলম্বন করা হোক।'

ইয়াযীদের এই নির্দেশ পেয়ে ওয়ালীদ ইবনে উত্‌বা কর্তব্য স্থীর করতে না পেরে মদীনার ভূতপূর্ব গভর্ণর মারওয়ানের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে দূত পাঠালেন। মারওয়ান ওয়ালীদকে পরামর্শ দিলেন– 'এখনও হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যু সংবাদ মদীনায় ব্যাপকহারে প্রচারিত হয়নি। আমরা সীমিত কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে অজ্ঞ। তাই যতশীঘ্র সম্ভব সকলকে গভর্ণর হাউজে তলব করে বাই'আতের জন্য অনুরোধ করা হোক। যদি তারা বাই'আত গ্রহণ করেন, তবে তো আর কোন সমস্যাই থাকে না। আর যদি বাই'আত করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সময় নষ্ট না করে সাথে সাথেই গভর্ণর হাউজের অভ্যন্তরে তাঁদের হত্যা করে ফেলতে হবে।

মদীনার গভর্ণর তৎক্ষণাৎ হযরত হুসাইন ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'কে গভর্ণর হাউজে ডেকে আনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে প্রেরণ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর উভয়কে মসজিদে নববীতে পেয়ে মদীনার গভর্ণরের নির্দেশের কথা তাঁদের জানালেন। উভয়ই কিছুক্ষণের ভিতর আসছেন বলে তাকে বিদায় করলেন।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে সম্বোধন করে বললেন–

'এ সময়ে আমাদের গভর্ণর হাউজে তলব করার পিছনে নিশ্চয়ই বিশেষ

কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' স্বীয় প্রজ্ঞা বলে প্রকৃত ঘটনা তখনই অনুধাবন করতে পেরে বললেন–

'নিশ্চয়ই হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইন্তেকাল করেছেন। যে কারণে তারা এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই আমাদের থেকে জোর পূর্বক বাই'আত নিয়ে নিতে চায়।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কথার সাথে এক মত হলেন, এবং এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়, তার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে বললেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'এ পরিস্থিতিতে গভর্ণর হাউজে একা যাওয়া আমাদের জন্য সমীচিন হবে না বরং কিছু যুবককে গভর্ণর হাউজের সামনে রেখে আমরা ভিতরে যাব ।প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নেব।'

পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা গভর্ণর হাউজে উপস্থিত হলেন। ঐ সময় ওয়ালীদের পাশে মারওয়ান উপবিষ্ট ছিল। সালামের পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উভয়কে নসীহত করতঃ বললেন– 'ইতিপূর্বে তোমাদের ভিতর মন কষাকষি ছিল, আজ তোমাদের একত্রে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন সবসময় তোমাদের মাঝে সু-সম্পর্ক বজায় রাখেন।'

অতঃপর ওয়ালীদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে ইয়াযীদের পত্র পেশ করলেন। পত্রে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যুর সংবাদ এবং তার স্বীয় বাই'আতের আহ্বান লিপিবদ্ধ ছিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকালের সংবাদে গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করলেন। আর বাই'আতের ব্যাপারে বললেন– 'আমার জন্য নির্জন গোপন কক্ষে বাই'আত করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। বরং আপনি সকলকে একত্রিত করুন। সেখানে আমি উপস্থিত হয়ে যা করার তাই করব।'

ওয়ালীদ ছিলেন একজন প্রশান্ত হৃদয়ের লোক। সব সময় বিশৃংখলা এড়িয়ে চলতে ভালবাসতেন। তিনি হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর এ প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করে তাঁকে বিদায় নেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু মারওয়ান ওয়ালীদের এ কাজে সন্তুষ্ট না হতে পেরে সরাসরি বলে ফেলল–

'হুসাইনকে ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') এ মুহূর্তে হাতছাড়া করা ঠিক হচ্ছে না। একবার নাগালের বাইরে চলে গেলে দ্বিতীয়বার আর তাকে হাতের মুঠোতে আনা সম্ভব হবে না। তাই যা করার এখনি সেরে ফেলা উচিত। হুসাইন যদি স্বেচ্ছায় বাই'আত গ্রহণ না করে, তবে তাকে এ মুহূর্তেই হত্যা করে ফেলা উচিত।

মারওয়ানের আচরণে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' খুবই ক্ষুব্ধ হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাকে বললেন–

'তুমি কে! যে আমাকে হত্যার হুমকী দিচ্ছ?' এ কথা বলে তিনি গভর্ণর হাউজ থেকে বের হয়ে আসলেন।

মারওয়ান ওয়ালীদকে ভর্ৎসনা করে বলল– 'তুমি শিকার হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে, এমন সুযোগ কি তুমি দ্বিতীয়বার পাবে মনে কর?'

ওয়ালীদ বলল–

'সারা পৃথিবীর ধন ভাণ্ডারের লোভ দেখিয়েও যদি আমাকে বলা হয় যে, হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে হত্যা করতে হবে। তবে সেই ধনভাণ্ডারের দিকে আমি তাকিয়েও দেখব না। কারণ হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র রক্তে যার হাত রঞ্জিত হবে, কিয়ামতের মাঠে সে মুক্তি পাওয়ার আশাও করতে পারে না।' (১)

গভর্ণর হাউজ থেকে বের হয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইয়াযীদকে খলীফাতুল মুসলিমীন হিসাবে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। এর পরিণামে তাঁকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

তাই তিনি মদীনা থেকে মক্কায় হিযরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পরিস্থিতি ঘোলাটে দেখে ইতিপূর্বেই স্বপরিবারে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। হযরত হুসাইন

---

(১) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (মূলগ্রন্থ) খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৪৭
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা -২৬৪

'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কা যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলে করীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র রওযা মুবারক যিয়ারত করেন এবং আল্লাহ'র দরবারে মুনাজাত করেন। অতঃপর আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় নিয়ে স্বপরিবারে মদীনা ত্যাগ করেন।

এই সংবাদ পেয়ে ইয়াযীদ অত্যধিক ক্রোধান্বিত হল এবং অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগে ওয়ালীদ ইবনে উত্বাকে বরখাস্ত করে আমর ইবনে সাঈদকে মদীনার গভর্ণর করে পাঠাল। আর সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভাই আমর ইবনে যুবায়েরকে। কারণ ইয়াযীদের এ কথা জানা ছিল যে, দু'ভাইয়ের সম্পর্কে বড় ধরনের ফাটল রয়েছে।

অতঃপর নবমনোনীত গভর্ণর আমর ইবনে সাঈদের নির্দেশক্রমে আমর ইবনে যুবায়ের হযরত হুসাইন ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'কে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কাভিমুখে যাত্রা করল। মক্কার মত পবিত্র স্থানে এ ধরনের একটি জঘন্য অপরাধ হতে যাচ্ছে দেখে, অনেকে তাদের এ সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেও তারা এ সৎ পরামর্শ গ্রহণ না করে মনগড়া কিছু যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তকেই সময়োচিত ও যথাযথ হিসেবে প্রমাণ করার প্রয়াস পেল।

আমর ইবনে যুবায়রের নেতৃত্বে দুই হাজার সেনাবাহিনীর একটি দল মক্কার নিকটবর্তী এক স্থানে অবস্থান নিল এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট লোক প্রেরণ করে সংবাদ পাঠাল যে, আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য ইয়াযীদ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমি চাই না যে, আমার দ্বারা মক্কার পবিত্র স্থানে রক্তপাত ঘটুক। তাই কাল বিলম্ব না করে আপনি আমার নিকট আত্মসমর্পণ করুন। অন্যথায় যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হব । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এদের মুকাবিলা করার জন্য জানবায কিছু যুবক প্রেরণ করলেন। অল্পক্ষণের মাঝেই 'আমরের বাহিনী তাঁদের হাতে পরাজয় বরণ করল।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কায় আগমন করার পব মদীনার গভর্ণর বেশ কয়েকবার তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার হুমকী দেয়। কিন্তু মক্কার গভর্ণর অতিশয় শরীফ, ভদ্র, নম্র ছিলেন বিধায় রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র কলিজার টুকরার উপর সামান্যতম আঘাত আসুক, তিনি তা কখনো বরদাশ্‌ত করতেন না। যে কারণে মক্কায় তিনি নির্জনে ইবাদাত বন্দেগীর ভিতর অতি সুন্দর নিরাপদ জীবন যাপন করছিলেন। (১)

পরিস্থিতি যাচাইয়ে মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-এর কূফা গমন
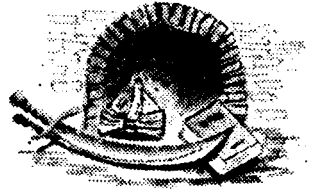
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইয়াযীদকে নসীহত করে গিয়ে ছিলেন যে, আমার ধারণা কূফাবাসী তোমার মুকাবেলায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে দাঁড় করাবে।' পরবর্তী কালে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল।

কূফাবাসী যখন হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকালের সংবাদ জানতে পারল এবং এ কথাও জানতে পারল যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'সহ কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তখন তারাও সম্মিলিতভাবে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পত্র প্রেরণ করল যে–

'আমরাও ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে রাজী নই। আপনার মত সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের বর্তমানে আমরা ইয়াযীদকে আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত নই। মেহেরবানী পূর্বক সময় ক্ষেপণ না করে আপনি আমাদের এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন এবং আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ

১। তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ১৫৩-২৫৫
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৬

করুন। আমরা এখানে নেতৃত্ব শূন্যতায় বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। আপনি আমাদের এখানে তাশরীফ আনলে আমরা সকলে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োজিত গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীরকে কূফা নগর থেকে বের করে দিব ।'

এরপর থেকে একই বিষয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট অনবরত চিঠি আসতে লাগল। তাতে ইয়াযীদ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগের স্ববিস্তার বর্ণনা এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ ছিল।

একে একে একশত পঞ্চাশটিরও অধিক পত্র হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হস্তগত হল। এ ছাড়া কয়েকটি প্রতিনিধি দল এসেও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে কূফায় চলে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল। [১]

কূফাবাসীর অগণিত পত্র, তদুপরি বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আন্তরিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন যে, এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়? সকলেই পরামর্শ দিয়ে বললেন– 'কূফাবাসী ইতিপূর্বেও বহুবার ধোকা দিয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকার কখনও রক্ষা করেনি।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'তারা আমার নিকট শত শত পত্র প্রেরণ করেছে এবং তাদের বহু প্রতিনিধিও আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, আপনারা কি এই সবকেই মিথ্যা বলতে চান?'

শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে পরামর্শ দিলেন–

'একান্ত যদি সেখানে যেতেই হয়, তবে আগে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠানো প্রয়োজন।' এ প্রস্তাব অনুযায়ী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আপন চাচাত ভাই হযরত 'মুসলিম ইবনে

১। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৫২
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৬
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৬২-২৬৩

আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে একটি পত্র দিয়ে কূফায় প্রেরণ করলেন। পত্রের বক্তব্য ছিল–

'সালামান্তে, আপনাদের সকলের চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমি আমার বিশ্বস্ত চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীল ('রাযিয়াল্লাহু আনহু')-কে আপনাদের নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমাকে পত্রের মাধ্যমে অবগত করলেই আমি আপনাদের নিকট চলে আসব ।' (ইনশাআল্লাহ)

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফা যাত্রার প্রাক্কালে মদীনায় আগমন করেন এবং নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বিদায় গ্রহণ করে মসজিদে নববীতে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর কূফার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। (১)

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল কূফায় পৌছে সর্ব প্রথম 'মুখতার' নামক এক লোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকেই স্থানীয় জনগণের মনোভাব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। পরিস্থিতি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনুকূল দেখে তিনি কূফাবাসীকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র চিঠি পড়ে শুনালেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ পেয়ে তারা যেন আশার আলো দেখতে পেল। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বেশ কিছুদিন কূফায় অবস্থান করে এ কথা অনুধাবন করতে পারলেন যে, কূফার জনসাধারণ ইয়াযীদকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং তারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। তাই তিনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ থেকে বাই'আত নিতে আরম্ভ করলেন। অল্প কয়েকদিনের ভিতর শুধুমাত্র কূফা থেকেই আঠার হাজার লোক তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করল এবং দিন দিন এই সংখ্যা শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকল।

জনগণের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও গভীর আগ্রহ দেখে হযরত মুসলিম

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৭

ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট এই মর্মে পত্র লিখলেন যে,

'কূফাবাসী আপনার অত্যন্ত অনুগত। পত্র পাওয়া মাত্র আপনি এখানে চলে আসুন। আমার বিশ্বাস আপনি চলে আসার সাথে সাথে কূফার সর্বস্তরের জনগণ আপনার হাতে বাই'আত নিবে এবং এখানে একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।' (১)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পত্র প্রেরণ করার পর পরই পরিস্থিতির পট খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করল। ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োজিত কূফার গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীর অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও নবী কারীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। নবী বংশের লোকদের তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করতে কখনও তিনি কসুর করতেন না। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে খেলাফতের বাই'আত নিচ্ছেন, তখন তিনি সকলকে একত্রিত করে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ভাষায় এক ভাষণে বললেন–

'হে কূফাবাসী! আমি কারও সাথে যুদ্ধে জড়িত হতে চাই না এবং শুধুমাত্র সন্দেহ ও মিথ্যা অপবাদের উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করার ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু জেনে রেখ; যদি তোমাদের থেকে কোন প্রকার বিদ্রোহের ভাব অথবা ইয়াযীদের বাই'আত ভংগের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে আমি আল্লাহ'র নামে শপথ করে বলছি, তোমাদের বক্রতা সোজা করতে আমার এই তরবারীই যথেষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত তরবারীর বাট আমার হাতে থাকে, আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।'

নু'মান ইবনে বশীরের ভাষণের পর আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম নামক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল– 'আপনার সামনে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তাকে

---

(১) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ২৫২, তারীখে তাবরী খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৫৮, আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৭

নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে আরও কঠোর হতে হবে। কাপুরুষের ন্যায় নম্র ব্যবহারে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না।'

উত্তরে নু'মান ইবনে বশীর বললেন–

'গোনাহ'র কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেকে বীর বাহাদুর প্রমাণ করার চেয়ে আল্লাহ'র আদেশ পালন করতে গিয়ে যদি আমাকে কাপুরুষ ও দুর্বল মনে হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই।'

নু'মান ইবনে বশীরের এ নমনীয়তা দেখে আরও অনেকে ক্ষুব্ধ হল। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিমসহ বেশ কয়েকজন পরামর্শ করে সরাসরি ইয়াযীদের নিকট পত্র প্রেরণ করে কূফায় মসুলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আগমন এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে বাই'আত গ্রহণ ও নু'মান ইবনে বশীরের নমনীয়তা প্রদর্শনের পূর্ণ বৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়ে দিল। (১)

নু'মান ইবনে বশীরের অপসারণ ইবনে যিয়াদের কূফায় আগমন

আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিমের পত্র ইয়াযীদের হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে তার একান্ত সচিবদের নিয়ে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, নু'মান ইবনে বশীরকে গভর্ণরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে 'উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ'কে একই সাথে কূফা এবং বসরার গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হোক। ইবনে যিয়াদ পূর্ব থেকে বসরার গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিল।

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ২৬৭,
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৬৪

ইবনে যিয়াদকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ করার সাথে সাথে ইয়াযীদ পত্র মারফত তার নিকট নির্দেশ প্রেরণ করল যে, 'এ চিঠি প্রাপ্তির পর কালবিলম্ব না করে কূফায় চলে যাবে এবং মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যা, গ্রেফতার অথবা কূফানগরী থেকে বের করে দিবে।' (১)

ইয়াযীদের পক্ষ থেকে ইবনে যিয়াদ এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে বসরা থেকে কূফা যাত্রার জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কিন্তু এদিকে ঘটে গেল অন্য এক ঘটনা। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ থেকে বসরাবাসীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র আসল, তাতে লিখা ছিল–

'হে বসরাবাসী! আপনাদের অজানা নয় যে, পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র সুন্নাত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ'আতের সায়লাবে সারা দেশ ভেসে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের আহ্বান করছি, আপনারা কুরআন সুন্নাহর সংরক্ষণ করুন এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন।'

পত্রটি প্রেরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। তাই সকলেই এর গোপনীয়তার ব্যাপারে সদা সতর্ক ছিল। কিন্তু 'মুনযির ইবনে জারূদ' নামক এক ব্যক্তি পত্র বাহককে স্বয়ং ইবনে যিয়াদের চর মনে করে ইবনে যিয়াদের সামনে হাজির করে দিল। ইবনে যিয়াদ পত্রখানা পাঠ করার সাথে সাথে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। নির্দেশ মুতাবেক তাকে হত্যা করা হল। অতঃপর বসরাবাসীকে একত্রিত করে ইবনে যিয়াদ কঠোর ভাষায় এক ভাষণ দিল–

'যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতায় লিপ্ত হবে, তার জন্য আমি নিজেই ভয়ানক শাস্তি হয়ে দেখা দিব। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সংহতি প্রকাশ করবে, তার জন্য আমি শান্তির বার্তাবাহক।

হে বসরাবাসী! তোমরা ভাল করে জেনে রাখ, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে কূফায় যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁর নির্দেশ মুতাবেক আমি

৫

---

(১) তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৫৮

আগামীকাল কূফার পথে যাত্রা করব । আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই 'উসমান ইবনে যিয়াদ' বসরার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। আমি তোমাদের সতর্ক করে যাচ্ছি, তার নির্দেশের বিপরীত কিছু করার চিন্তাও যেন তোমাদের মস্তিষ্কে উঁকি না দেয়। যদি কারও সম্পর্কে আমার নিকট এ জাতীয় রিপোর্ট আসে,তাহলে মনে করবে দুনিয়ায় তার সময় ফুরিয়ে গেছে এবং শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তার পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও হত্যা করা হবে। এমনকি তার বংশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও রেহাই পাবে না। তোমরা ইবনে যিয়াদকে ভাল করেই চিন।' (১)

অতঃপর ইবনে যিয়াদ নিতান্ত সাধারণ বেশে দু'জন অনুচর সঙ্গে নিয়ে কূফার পথে যাত্রা করল। এদিকে কূফার জনসাধারণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আগমনের অপেক্ষায় ছিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মৌখিক পরিচয় তাদের নিকট থাকলেও তাঁর আদল আকৃতি সম্পর্কে তাদের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞ। কেননা ইতিপূর্বে কখনও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। তাই ইবনে যিয়াদ যখন কূফা নগরীতে এসে পৌঁছল, তখন তারা তাকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শুভাগমন ভেবে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে আরম্ভ করল এবং সকলে সমস্বরে বলতে লাগল– 'আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া ইবনা রাসূলিল্লাহ!'

ইবনে যিয়াদ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে নীরবে কূফাবাসীদের এই আচরণ বরদাশ্‌ত করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারল যে, সমগ্র কূফার গণরায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে চলে গেছে।

অল্পক্ষণের মাঝে কূফা নগরীতে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আগমন করেছেন। তাই জনসাধারণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে এক নজর দেখার জন্য ভীড় জমাতে শুরু

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৮
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৫২
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৬৫-২৬৬

করল। কূফার গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীরের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি গভর্ণর হাউজের সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। ইবনে যিয়াদ গভর্ণর হাউজের নিকট পৌছে এ দৃশ্য অবলোকন করে আশ্চার্যন্বিত হয়ে গেল। মুহূর্তের ভিতর গভর্ণর হাউজের সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল এবং তাদের হট্টগোল ব্যাপক আকার ধারণ করল। নু'মান ইবনে বশীর ইবনে যিয়াদকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আগমন ভেবে গভর্ণর হাউজের ভিতর থেকে উচ্চস্বরে বললেন–

'হে রাসূল তনয়! আপনি জেনে রাখুন, ইয়াযীদের পক্ষ থেকে কূফার যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে, তা আমি কখনও আপনার হাতে ন্যস্ত করতে পারব না। তাছাড়া আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত নই। স্বেচ্ছায় আপনি এখান থেকে চলে যান।'

ইবনে যিয়াদ নীরবে কূফাবাসী ও গভর্ণরের ভূমিকা দেখে যাচ্ছিল। অবশেষে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং দরজার খুব নিকটে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল–

'নু'মান! দরজা খোল, আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ। ইয়াযীদের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি।'

এ কথা শুনার সাথে সাথে উপস্থিত জনতা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। নু'মান ইবনে বশীর গভর্ণর হাউজের দরজা খুলে দিলে ইবনে যিয়াদ ভিতরে প্রবেশ করল।

নু'মান ইবনে বশীর থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ইবনে যিয়াদ দ্বিতীয় দিন সকালেই কূফাবাসীকে একত্রিত করে এক সুদীর্ঘ ভাষণে বলল–

'আমীরুল মু'মিনীন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি নির্যাতিত তার উপর যেন ইনসাফ করা হয় এবং যাকে নিজের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার প্রাপ্য যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আদায় করা হয়। আর যে তার আনুগত্য ও অধীনস্ততা স্বীকার করে, তার সাথে যেন ভদ্র ব্যবহার করা হয়, আর যে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে অথবা যাকে এ ধরনের কাজে লিপ্ত বলে ধারণা করা হয়, তার সাথে কঠোর আচরণ করা হয়। তোমরা

ভালোভাবে জেনে রেখ, আমি অবশ্যই আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করব । আমি সঠিক সুন্দর পথে পরিচালিত ব্যক্তিদের জন্য অতি দয়ালু, উদার পিতার চেয়ে দয়ালু এবং আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারকারীদের জন্য আমি এক স্নেহময়ী মায়ের চেয়ে বেশী স্নেহশীল। আমার উন্মুক্ত তরবারী ও চাবুক চলে শুধু তাদের উপর, যারা আমার আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহের বীজ ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে আমার নির্দেশ অমান্য করে। আমার বিশ্বাস তোমরা জীবনের উপর ঝুঁকি না নিয়ে আনুগত্যের পথই আবলম্বন করবে।'

অতঃপর ইবনে যিয়াদ শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর নির্দেশ জারী করল যে, কূফানগরীতে যে সকল বিদেশী নাগরিক অবস্থান করছে অথবা যারা ইয়াযীদের বিরোধিতা করছে, তাদের তালিকা প্রণয়ন করে অতি সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করুন। যারা এ তালিকা প্রণয়নে সহযোগিতা করবে, তারা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে, আর যারা এ তালিকা প্রণয়নে অসম্মতি প্রকাশ করবে বা বাধা সৃষ্টি করবে, দোষীদের তালিকায় তাদের নাম উঠবে। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুদণ্ড। আর যারা প্রকাশ্যে ইয়াযীদের বিরোধিতা করবে, তাদেরকে গভর্ণর হাউজের সামনে শূলিতে চড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে।

এদিকে মুসলিম ইবনে আকীল তখনও মুখতারের বাড়ীতে অবস্থান করে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে বাই'আত গ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ইবনে যিয়াদের ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হয়ে চিন্তা করলেন– এখানে অবস্থান করা আমার জন্য আর মোটেও সমীচীন হবে না। কূফার অনেকেই এখানে আমার অবস্থানের কথা জানে। তাই তিনি অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে অতি গোপনে বের হয়ে গেলেন এবং হানী ইবনে উরওয়াহ'র বাড়ীতে গিয়ে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। হানী ইবনে উরওয়াহ কূফার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। হানী মুসলিম ইবনে আকীলকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে বললেন–

'আপনি যখন আমার বাড়ী চলেই এসেছেন, তখন একজন মেহমান হিসেবে আপনার আশ্রয় নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। আমার বাড়ীতেই

আপনার থাকার ব্যবস্থা করছি। মেহমান হয়ে না আসলে আমি আপনাকে আমার বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিতাম। যা' হোক এখন আপনি নির্বিঘ্নেই আমার বাড়ীতে অবস্থান করতে পারেন।' (১)

অভিনব কৌশলে মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-কে গ্রেফতার

মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-কে গ্রেফতার করার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, কোন ক্রমেই যখন মুসলিম ইবনে আকীলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না, রাগে ক্ষোভে ইবনে যিয়াদের তখন দিশাহারা অবস্থা। ক্ষমতার জোরে সফলতার মুখ দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তখন সে কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সে তার বিশ্বস্ত একজন অনুচরকে 'তিন হাজার' দিরহাম দিয়ে শিখিয়ে দিল 'জন সাধারণের নিকট নিজেকে তুমি একজন মুসাফির হিসেবে পরিচয় দিবে এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জিহাদী তহবিলে এ টাকা জমা দেয়ার কথা বলে মুসলিম ইবনে আকীলের সন্ধান চালাবে।'

ইবনে যিয়াদের কথা মত গুপ্তচর তার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিল। দু'তিনজন মানুষকে একত্রে আলাপ করতে দেখলেই নিজেকে মুসাফির জাহির করে শিখিয়ে দেয়া কেচ্ছা শুনাতে আরম্ভ করল। এভাবে চলতে থাকল তার তল্লাশি অভিযান। কিন্তু এ নাজুক পরিস্থিতিতে তাকে বিশ্বাস করার মত এত বড় ঝুঁকি নেয়ার সাহস কারো হল না। সতর্ক প্রতিটি নাগরিকই তাকে সযত্নে এড়িয়ে গেল। মুসলিম ইবনে আকীলের সন্ধান কেউ তাকে দিল না। ইবনে যিয়াদ এ কৌশল ও গুপ্তচরবৃত্তি দ্বারা সফলতার আশা যখন ছেড়েই দিচ্ছিল,

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৯

অনেক চেষ্টার পরেও সামান্য একটি সূত্রও যখন সে খুঁজে পাচ্ছিল না, গুপ্তচর যখন নৈরাশ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তেমনি সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই সে সফলতার আলো দেখতে পেল।

সে একদিন কূফার মসজিদে নামায আদায়ের পর 'মুসলিম ইবনে আ'উসাজা' নামক এক সহজ সরল বৃদ্ধের কাছে তার বানোয়াট কাহিনী যখন বড় করুণ আকারে শুনাল যে- 'আমি শাম দেশের একজন বাসিন্দা, আল্লাহ তা'আলার হাজারো শুকরিয়া যে, তিনি আমার অন্তরে নবীর বংশের মুহব্বত দান করেছেন। কিন্তু হ্যায় আফসোস! জীবনে তাঁদের কাউকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হল না। তাই মনে বড় আশা নিয়ে শাম থেকে এসেছি। শুনেছি মুসলিম ইবনে আকীল নাকি এখানে হযরত হুসাইনের পক্ষ থেকে বাই'আত নিচ্ছেন। একান্ত খাহেশ থাকা সত্ত্বেও অনেক তল্লাশি চালানোর পরও আমি আজ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পেলাম না। সন্ধান পেলে তাঁর হাতে বাই'আত নিয়ে এ তিন হাজার দিরহাম হযরত হুসাইনের জেহাদী তহবিলে দান করে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। শুনেছি, আপনি তাঁর সন্ধান জানেন! তাই বড় আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। আর যদি আমার ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে না পারেন, তবে আপনি নিজে তাঁর পক্ষ থেকে আমার বাই'আত গ্রহণ করুন। আর এই তিন হাজার দিরহাম তাঁর জেহাদী ফাণ্ডে দিয়ে দিবেন। এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

মুসলিম ইবনে আ'উসাজা তার এ সুনিপূন অভিনয় বুঝতে না পেরে বললেন- 'আপনার সাক্ষাতে আমিও আনন্দ বোধ করছি। ইনশাআল্লাহ আপনার অন্তরের ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার দ্বারা নবী বংশের অনেক খেদমত নিবেন।' তদুপরি তিনি মনে মনে ভয় পেলেন যে, মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে আমার সম্পর্কের কথা এ লোক যখন জানে, তবে আরো লোক একথা জানার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি তাই হয় তবে আর উপায় থাকবে না, সর্বনাশ হয়ে যাবে! ইত্যাদি আশংকার কারণে তিনি তাকে সেদিনকার মত মুসলিম ইবনে আকীলের নিকট না নিয়ে তার কাছ থেকে শপথ নিলেন যে- 'এ সংবাদ আর কাউকে জানানো যাবে না, দু' জনের মাঝেই সীমিত রাখতে হবে।' এরপর থেকে সে মুসলিম ইবনে

আকীলের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় প্রতিনিয়ত তার কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল।

ঘটনা চক্রে হানী ইবনে উরওয়াহ্ (যার ঘরে হযরত মুসলিম ইবনে আকীল আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কূফার নিয়ম ছিল, প্রভাবশালী বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে স্বয়ং গভর্ণর এসে তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে যেত । ইবনে যিয়াদ হানীর অসুস্থতার সংবাদ শুনে তার বাড়ীতে আসল। তখন তার কিছু সাথী পরামর্শ দিল- 'এমন সুযোগ পেয়ে দুশমনকে হাত ছাড়া করা কিছুতেই ঠিক হবে না, এখানেই তাকে হত্যা করা না হলে, আর হয়ত সুযোগ আসবে না।' কিন্তু হানী ইবনে উরওয়াহ্'র মানবতাবোধ ছিল অনেক উচুমানের। তিনি বললেন- 'ইবনে যিয়াদ এখন আমার মেহমান। মেহমানের সাথে আমি অন্ততঃ এ ধরণের জঘন্য আচরণ করতে পারব না। ইসলাম এমন হত্যাকে শুধু ঘৃণাই করে।' হানীকে দেখে ইবনে যিয়াদ চলে গেল। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীল যে, হানীর বাড়ীতে, তারই এত কাছাকাছি অবস্থান করছেন, ঘুণাক্ষরেও তা সে টের পেল না।

এদিকে ইবনে যিয়াদের গুপ্তচর বার বার মুসলিম ইবনে আ'উসাজার নিকট এসে নবী বংশের প্রতি তার ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করে পীড়াপীড়ি শুরু করল যে- 'একবারের জন্যে হলেও মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তাহলে আমার প্রাণ জুড়ায়।' তার অন্তরে নবী বংশের প্রতি বিপুল প্রেম ও মুহাব্বত লক্ষ্য করে তিনি তাকে মুসলিম ইবনে আকীলের কাছে নিয়ে যেতে আর সংশয় প্রকাশের কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন। সে মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে বাই'আত গ্রহণ করে জেহাদী তহবিলে তিন হাজার দিরহাম জমা দিয়ে দিল শুধু বিশ্বাস অর্জনের জন্য।

অতঃপর প্রতিদিন এখানে তার যাতায়াত অব্যাহত থাকল। আসা যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ভিতরের যাবতীয় গোপন তথ্য অতি সন্তর্পনে ইবনে যিয়াদের নিকট সরবরাহ করতে থাকল। সব জানার পর খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইবনে যিয়াদ হানীকে গভর্ণর হাউজে ডেকে পাঠাল। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই হানী বুঝে ফেললেন যে, ইবনে যিয়াদ তাকে কি জন্য

তলব করেছে। যেভাবেই হোক সে সমস্ত খবর জেনে ফেলেছে। বিকল্প কোন উপায় না দেখে অগত্যা তিনি গভর্ণর হাউজে উপস্থিত হলেন।

উপস্থিত হওয়ার পর ইবনে যিয়াদ হানীকে প্রশ্ন করল– 'মুসলিম ইবনে আকীল আপনার বাড়ী অবস্থান করে আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন, আর আপনি আশ্রয় দিয়ে তার সহযোগিতা করছেন?' প্রথমে তিনি পুরো ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করলেন। অনেক চাপাচাপির পরও যখন তিনি কোনক্রমেই স্বীকার করলেন না, ইবনে যিয়াদ তখন সেই গুপ্তচরকে হাজির করলে সে সবার সামনে ঘটনার পুরো বিবরণ তুলে ধরল। তখন আর হানীর পক্ষে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকল না।

তিনি বললেন– 'মুসলিম ইবনে আকীলকে আমি আমার বাড়ীতে দাওয়াত দিয়ে আনিনি। আর তার কর্ম তৎপরতা সম্পর্কেও আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হঠাৎ একদিন তিনি আমার বাড়ী এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। একজন মেহমানের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আর মেহমান হিসাবে তার নিরাপত্তার সমস্ত দিক আমাকেই বিবেচনার সাথে সামলাতে হয়েছে। একান্ত অপারগ হয়েই আমি তাকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছি। তবে কথা দিচ্ছি, আপনি যদি বলেন, এখান থেকে গিয়েই আমি তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেব।'

ইবনে যিয়াদ বলল– 'এ হয় না। তাকে আমার হাতে তুলে দিন। হানী বলল– 'মেহমানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার মত জঘণ্য কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।' হানীর এ ব্যবহারে ইবনে যিয়াদ খুবই ক্ষুব্ধ হল। উপস্থিত লোকদের মাঝে এক ব্যক্তি হানীকে পৃথকভাবে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করল যে– 'এ পরিস্থিতিতে মুসলিম ইবনে আকীলকে ইবনে যিয়াদের হাতে সোপর্দ না করলে তোমার মৃত্যু কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। নিজের জীবনকে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে, তুমি বরং ইবনে যিয়াদের কথা শুন। মুসলিম ইবনে আকীলকে তার হাতে তুলে দাও।'

হানী বললেন– 'নিজের মেহমানকে দুশমনের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? আল্লাহ'র শপথ! এ ব্যাপারে যদি একজন লোকও আমার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার আশ্বাস না দেয়, তবুও আমি

মেহমানকে দুশমনের হাতে তুলে দিব না। জীবন থাকতে না।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ আর স্থীর থাকতে পারল না। সাথীদের নিয়ে সে চড়াও হল হানীর উপর। আঘাতে আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করে ফেলল। এক পর্যায় হানীর নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। কিন্তু শুধু এতেই ইবনে যিয়াদের রাগ ঠাণ্ডা হল না। উপরন্তু সে হানীকে এই বলে হুমকী প্রদর্শন করল– 'এই মুহূর্তে তুমি যদি মুসলিমকে আমার হাতে তুলে না দাও, তবে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।'

হানী বললেন– 'আমার হত্যার পরিণামকে এত সহজভাবে নিয়ো না। জেনে রেখ, আমাকে হত্যা করলে তোমার গভর্ণর হাউজে রক্তের স্রোত বয়ে যাবে।' হানীর এই উত্তরে ইবনে যিয়াদের ক্রোধ আরো চরমে উঠল। ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে সে হানীর উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও তীব্রতর করল।

এদিকে কূফা নগরীতে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, হানীকে হত্যা করা হয়েছে। 'মোযাহ্হাজ' গোত্র যখন এ সংবাদ শুনল, তখন তারা গোত্রের যুবকদের নিয়ে গভর্ণর হাউজ ঘেরাও করে ফেলল।

ইবনে যিয়াদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কূফার বিচারপতিকে ডেকে এ কথা বলে দিল যে– 'আপনি জনতার সামনে গিয়ে বলুন যে, হানী গভর্ণর হাউজে সহীহ-সালামতেই আছে। তার কোন ক্ষতি হয়নি।' বিচারপতি যেন অন্য কোন কথা বলতে না পারে, তাই তার সাথে একজন লোক দিয়ে দিল। ইবনে যিয়াদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাদের একথা জানিয়ে দিলেন। বিচারপতির কথা শুনে জনতা শান্ত হল এবং নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

'হানী ইবনে উরওয়াহ্'র হত্যা এবং মুযাহ্হাজ গোত্রের ইবনে যিয়াদের গভর্ণর হাউজ ঘেরাও'– এর সংবাদ যখন মুসলিম ইবনে আকীলের নিকট পৌছল, তখন তিনি ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে চার হাজার লোক অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং ক্রমেই তার সংখ্যা শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকল।

মুসলিম ইবনে আকীল এই বিরাট বাহিনী নিয়ে গভর্ণর হাউজের দিকে

অগ্রসর হতে লাগলেন। ইবনে যিয়াদ কোন গত্যান্তর না দেখে গভর্ণর হাউজের সকল দরজা বন্ধ করে দিল। মুসলিম ইবনে আকীল তাঁর বাহিনী নিয়ে গভর্ণর হাউজ ঘেরাও করে ফেললেন। গভর্ণর হাউজের আশ পাশের মসজিদ এবং বাজারগুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করল। এ সময় গভর্ণর হাউজে মাত্র ত্রিশজন সাধারণ সৈনিক এবং কতিপয় গোত্রের বিশজন শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাচ্ছে দেখে ইবনে যিয়াদ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে এ বিদ্রোহ দমন করার জন্য মনোনয়ন করল। বিদ্রোহী গোত্র সমূহের লোকদের উপর যাদের প্রভাব রয়েছে, যাদের কথায় তারা উঠে বসে, ইবনে যিয়াদ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল– 'আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের, টাকা পয়সা, ক্ষমতার লোভ, অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে, যাকে যেভাবে সম্ভব মুসলিম ইবনে আকীলের দল থেকে পৃথক করে দিন।'

ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মুতাবেক তারা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে এ ষড়যন্ত্র আনজাম দিতে অগ্রসর হল। বিভিন্ন গোত্রের লোকজন তাদের নেতৃবৃন্দের প্রবঞ্চনায় জড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। মহিলারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যার যার আত্মীয়-স্বজনদের ফিরিয়ে নিতে লাগল। এভাবে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে মাত্র ত্রিশজন লোক অবশিষ্ট রইল।

পরিস্থিতির নাজুকতা অনুধাবন করে মুসলিম ইবনে আকীল খুব মর্মাহত মন নিয়ে স্থান পরিবর্তন করে অবশিষ্ট ত্রিশজনের কাফেলা নিয়েই 'কিন্দা' নামক ফটকের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তাকিয়ে দেখলেন যে, তিনি একাই শুধু রয়েছেন। আর একটি প্রাণীও তাঁর সাথে নেই। অবস্থা বেগতিক দেখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তিনি একটি আশ্রয়ের খোঁজে কূফার অলিতে গলিতে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। অবশেষে কিন্দার 'জাওয়াহ' নামক এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

'বিলাল' নামে বৃদ্ধার এক যুবক ছেলে ঐ বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ছেলের অপেক্ষাতেই সে বারান্দায় বসেছিল। মুসলিম ইবনে আকীল এ বাড়ীতে প্রবেশ করে বৃদ্ধার নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি চাইলেন। মহিলাটি ঘরের ভিতর থেকে এক গ্লাস পানি এনে দিল। পানি পান করে তিনি ওখানেই বসে থাকলেন। তাকে না উঠতে দেখে মহিলাটি বলল- 'পানি চেয়েছেন, দিয়েছি। এখন নিজের বাড়ী যান।' মুসলিম তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। এভাবে পরপর তিনবার মহিলাটি একই প্রশ্ন করেও যখন কোন উত্তর পেল না, তখন সে কঠোর ভাষায় বলল- 'আপনি এখন, এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।'

এখন আর নিশ্চুপ থাকা মুসলিম ইবনে আকীল সমীচীন মনে করলেন না। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি বললেন- 'মা! এই নগরীতে না আমার কোন ঘর বাড়ী আছে, না আছে কোন আত্মীয়-স্বজন। আমার নাম মুসলিম ইবনে আকীল। আপনি কি আমাকে আপনার ঘরে একটু আশ্রয় দিতে পারেন? কূফাবাসী আমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছে।' মুসলিমের এই করুণ অবস্থা দর্শনে মহিলাটির হৃদয় নরম হয়ে গেল। সে মুসলিমকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিল এবং রাতের খানা এনে তাঁর সামনে হাজির করল। কিন্তু তিনি এক লোকমাও মুখে দিতে পারলেন না। এমন সময় বৃদ্ধার ছেলে বিলাল বাড়ী আসল। মাকে বার বার ঘরের ভিতর যেতে দেখে বিলাল প্রশ্ন করল- 'মা ও ঘরে কে?' বৃদ্ধা প্রথমে ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত এই শর্তের উপর বলতে বাধ্য হল যে, সে এই সংবাদ কাউকে জানাতে পারবে না। (১)

১। আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৯-২৭২
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৩-১৫৫
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৯-২৮৮
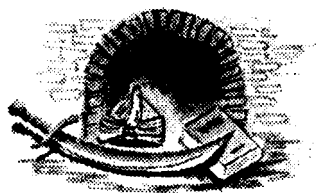
মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ

এদিকে ইবনে যিয়াদ গভর্ণর হাউজের বাহিরে শান্ত পরিবেশ অনুভব করে সৈন্যদের দ্বারা বাহিরের পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নিল। সৈন্যরা তাকে জানাল, পরিস্থিতি একেবারে শান্ত। তখন সে গভর্ণর হাউজ থেকে বের হয়ে এসে মসজিদের মিম্বারে আরোহণ করল এবং তার আপন লোকদের খুব কাছাকাছি বসিয়ে সকলকে মসজিদে একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করল। কিছুক্ষণের ভিতর লোকে আবার মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলল –

'নির্বোধ বোকা আকীল! সে শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করতে পারে। তোমরা সকলেই দেখেছ যে, সে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করেছে। এখনও হয়ত সে সেই চেষ্টাতেই সময় নষ্ট করছে। আমি ঘোষণা করছি, তাকে যার বাড়ীতে পাওয়া যাবে, তার কপালে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লেখা আছে। অপর দিকে যে পারবে তাকে আমার হাতে তুলে দিতে, তার জন্য অপেক্ষা করছে অভাবনীয় পুরস্কার। আমি আশা করব , তোমরা পুরস্কার হাসিলের জন্যই চেষ্টা করবে। তবে পৈত্রিক জান খোয়ানোর বাসনা যদি কারো হয়, সে ভিন্ন কথা।'

অপর দিকে ইবনে যিয়াদ তার সেনাবাহিনী প্রধানের উপর নির্দেশ জারী করল যে, 'শহরের প্রতিটি গলির মুখে সৈন্যদের কঠোর পাহারার ব্যবস্থা কর, শহরের একটি প্রাণীও যেন বাহিরে যেতে না পারে এবং প্রত্যেকের বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাও, যেভাবেই হোক মুসলিম ইবনে আকীলকে আমি চাই।'

ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মুতাবেক সেনাবাহিনী প্রধান শহরের প্রত্যেক গলির মুখে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে দিল এবং শহরের একদিক থেকে তল্লাশীর কাজ আরম্ভ করে দিল। বৃদ্ধার ছেলে (বিলাল) চিন্তা করল যে,

মুসলিমের খোঁজে সরকারী লোক শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরে আসবেই। অনিবার্য কারণেই তখন তিনি ধরা পড়ে যাবেন। সেই সাথে তাঁকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে আমাদের জান নিয়ে টানা-টানি পড়ে যাবে। অন্য দিকে তাঁর সন্ধান ইবনে যিয়াদকে জানাতে পারলে বড় ধরণের কোন পুরষ্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সে মায়ের অজান্তেই আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছকে মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থান জানিয়ে দিল। আর আব্দুর রহমান তার পিতার মাধ্যমে ইবনে যিয়াদ পর্যন্ত এ খবর পৌছে দিল। ইবনে যিয়াদ তখনি মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছের নেতৃত্বে সত্তরজনের একটি সেনাদল পাঠিয়ে দিল বৃদ্ধার বাড়ী অভিমুখে।

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সত্তরজনের এ বাহিনীটি অতর্কিতে অস্ত্রহীন, ক্ষুধাকাতর, অসহায় মুসলিমের উপর হামলা করে বসল। এতদসত্ত্বেও মুসলিম তাদের হাতে আত্মসমর্পন না করে ঈমানী শক্তির জোরে বীর বিক্রমে তরবারী চালাতে চালাতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। একাই তাদের ঘরের দরজা থেকে বাহিরে হটিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। তরবারীর আঘাতে অনেককে ক্ষত বিক্ষত করে আহতও করে দিলেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে তারা ঘরের ছাদের উপর উঠে মুসলিমকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে লাগল এবং ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। তবু মুসলিম ইবনে আকীল তাদের সকল পরিকল্পনা ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ মুসলিমের নিকটবর্তী হয়ে বলল–

'হে আল্লাহ'র বান্দা! আমি আপনার জীবনের নিরাপত্তা ঘোষণা করছি, অযথা আপনি আপনার মূল্যবান জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবেন না। আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি, আপনাকে কেউ হত্যা করবে না। আপনি আমার নিকট আত্মসমর্পন করুন।'

সত্তরজনের সাথে একাই মুকাবিলা করে মুসলিম ইবনে আকীল আহত ও পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাটির উপর বসে গেলেন এবং তাদের কথার উপর বিশ্বাস করে আত্মসমর্পন করলেন। তারা মুসলিম ইবনে আকীলকে একটি সওয়ারীর উপর আরোহন করিয়ে তার

হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিল। মুসলিম 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'তোমরা তো আমাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। আর এখন আমার হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ!

মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ বলল– 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার সাথে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হবে না।' মুসলিম ইবনে আকীল বললেন– 'আমি জানি এ গুলো বলা শুধু আমাকে শান্তনা দেয়ার জন্য। আমার ব্যাপারে ফয়সালা করার অধিকার তোমাদের হাতে নেই।' তিনি কথা বলছিলেন আর তার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

এ দৃশ্য দেখে একজন বলে উঠল– 'হে মুসলিম! আপনি যে পথে আছেন, এ পথে পরাজিত হলেও তো কাঁদার কোন কারণ নেই। তাহলে আপনি কাঁদছেন কেন?' প্রতি উত্তরে ইবনে আকীল বললেন– 'আমি আমার জীবন খোয়াব এই ভয়ে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'ও তাঁর পরিবার পরিজনের মহামূল্যবান জীবনের জন্য। ইতিপূর্বে আমি তাঁর নামে যে পত্র দিয়েছি, তা পাঠ করে তিনি হয়ত ইতিমধ্যে কূফার পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন। আমি এখানের অনুকূল অবস্থার কথা জানিয়ে তাঁকে তাশরিফ আনার কথা লিখেছিলাম। এখন যদি তিনি এখানে পরিবার সহ আগমন করেন তবে তাঁরাও আমার মত তোমাদের নির্যাতনের শিকার হবেন। আর এ অসহ্য অত্যাচার তাদের উপরও চালানো হবে।

অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছকে বললেন– 'তুমি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, কিন্তু আমার যতদুর মনে হয় যে, তুমি তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারবে না। কারণ আমাকে নিরাপত্তা দেয়ার মত ক্ষমতা বা অধিকার কোনটাই তোমার নেই। সঙ্গত কারণেই তোমার কথা কেউ শুনবে না। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে হত্যা করবেই। জীবন সায়াহ্নে আমি তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। তুমি বিশ্বস্ততার সাথেই তা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। কালক্ষেপন না করে তোমার বিশ্বস্ত একজন লোককে হযরত হুসাইনের নিকট সংবাদ দিয়ে পাঠাও যে, তিনি যেন এখানে না আসেন। পথে থাকলে সেখান থেকেই যেন মক্কায় ফিরে যান। কূফাবাসীর প্রেরিত চিঠি যেন তাঁকে ধোঁকায় না ফেলে। তারা বিশ্বাস ভংগ করেছে। তাঁর

পিতা হযরত আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যাদের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদের মৃত্যুর আকাংখা পোষণ করেছিলেন, সে আকাংখা যে যথার্থ তার প্রমাণ তারা আবারও দিয়েছে।'

মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ শপথ করে বলল– 'আমি আপনার অন্তরের আকাংখা অবশ্যই পূরণ করব ।' পরে সে তার অঙ্গীকার অনুযায়ী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট একজন লোক পাঠাল কূফার বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি জানিয়ে এবং পরামর্শ দিল যে, তিনি যেন কূফায় না এসে মক্কায় ফিরে যান।

মুহাম্মাদ ইবনে আশআ'ছের পত্র যখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে পৌছল, তখন তিনি কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'জুবালা' নামক স্থানে এসে তাবু ফেলেছেন। কূফার বিস্তারিত সংবাদ সম্পর্কে অবগত হয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'খোদার নির্ধারিত ভাগ্যকে খণ্ডানোর ক্ষমতা বা শক্তি কি কারো আছে? অতএব....

তাই বর্তমানে আমার একমাত্র ভরসা আল্লাহ তা'আলা। তাঁর কাছেই শুধু আমার জীবনের প্রতিদান চাব এবং কূফাবাসীর এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জন্য আল্লাহ'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব , অন্য কারো কাছে নয়।'

মোটকথা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পত্র প্রাপ্তির পর ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এদিকে মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ মুসলিম ইবনে আকীলকে নিয়ে গভর্ণর হাউজে উপস্থিত হল। মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ মুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছে, একথা শুনে ইবনে যিয়াদ ভীষণ রেগে গিয়ে বলল– 'আমি তোমাকে তার জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার মত ক্ষমতা দিয়ে পাঠাইনি, তাকে শুধু গ্রেফতার করে আনার জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম, তুমি তাকে নিরাপত্তা দেয়ার কে?' ইবনে যিয়াদের সামনে মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ আর কোন প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। মুসলিমের হয়ে একটি কথাও বলতে পারল না। নিশ্চুপ বসে রইল।

অতঃপর ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যা করার নির্দেশ

দিল। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনার পর মুসলিম ইবনে আকীল কিছু অছিয়ত করার সুযোগ প্রার্থনা করলেন। ইবনে যিয়াদ তাঁকে এ সুযোগটুকু প্রদান করল। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উমর ইবনে সা'আদকে সম্বোধন করে বললেন- 'আপনি আমার আত্মীয় বিধায় শুধু আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা বলতে চাই। উমর ইবনে সা'আদ প্রথমে দ্বিধা করছিলেন, ইবনে যিয়াদ তাকে কথা বলার অনুমতি দিলে মুসলিম ইবনে আকীল তাকে নিয়ে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বললেন-

'কূফার অমুক ব্যক্তি আমার নিকট 'সাতশত' দিরহাম পাবে, আমার পক্ষ থেকে আপনি সেগুলো পরিশোধ করে দিবেন। এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে কূফায় আসতে বারণ করবেন।'

উমর ইবনে সা'আদ ইবনে যিয়াদের নিকট মুসলিম ইবনে আকীলের অছিয়ত পূর্ণ করার অনুমতি চাইলে ইবনে যিয়াদ বলল- 'নিশ্চয়ই! বিশ্বস্ত ব্যক্তি কখনও তার অঙ্গীকার ভংগ করতে পারে না। তুমি তার ঋণ পরিশোধ করে দাও। আর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যাপার! যদি তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য না আসেন, তাহলে আমরা তাঁকে হটানোর চেষ্টা করব না। আর যদি তিনি এসেই পড়েন, তবে অগত্যা আমাদের তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্য পদক্ষেপ নিতেই হবে।'

অতঃপর ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলকে উদ্দেশ্য করে বলল- 'ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র ইয়াযীদকে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এক ইমামের নেতৃত্বে অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, কোথাও কোন বিশৃংখলার চিহ্ন মাত্র নেই। আর আপনারা মুষ্টিময় কয়েকজন লোক অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রের সর্বত্র বিশৃংখলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করে বেড়াচ্ছেন।'

মুসলিম ইবনে আকীল বললেন- 'প্রকৃত ঘটনা ঠিক এর বিপরীত। স্বীকৃত কোন পন্থায় ইয়াযীদ খলীফার মসনদে বসেনি, তদুপরি আমরা তার মাঝে খেলাফত চালানোর মত যোগ্যতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করছি। সত্যকথা হল, কূফার অধিকাংশ জনগণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে এখানকার নেতৃত্ব নেয়ার জন্য শত শত চিঠি ও অসংখ্য প্রতিনিধি দল

পাঠানোর প্রেক্ষিতেই আমি এখানে পরিস্থিতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এসেছি। এখানে আসার পর হযরত হুসাইনের নামে কূফাবাসীর থেকে বাই'আত নেয়া শুরু করি।'

মুসলিম ইবনে আকীলের কথায় ইবনে যিয়াদের রাগ চরমে পৌঁছে গেল এবং মুসলিমের মাথা দেহ থেকে পৃথক করে গভর্ণর হাউজের ছাদ থেকে নীচে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। ইবনে যিয়াদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। গভর্ণর হাউজের ছাদ থেকে তাঁর শির মোবারক নীচে নিক্ষেপ করা হল। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও মুসলিম ইবনে আকীলের ঠোঁট জোড়া আল্লাহ'র স্মরণে তাছবীহ তাহলীলে ব্যস্ত ছিল।

'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'

মুসলিম ইবনে আকীলের পর হানী ইবনে উরওয়াহকেও হত্যা করার সিদ্ধান্ত হল এবং তাকে কূফা বাজারে নিয়ে সর্ব সাধারণের সামনে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হল। মুসলিম ইবনে আকীল এবং হানী ইবনে উরওয়াহকে হত্যা করার পর ইবনে যিয়াদ তাদের উভয়ের শির ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দিল। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদের কাজে খুশি হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিল–

'আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইরাকের নিকট পৌঁছে গেছেন। তাই কূফা নগরীর আশপাশে সর্বত্র গুপ্তচর বাহিনীর মাধ্যমে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যার ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, সে হযরত হুসাইনের সহযোগিতা করছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় পুরে রাখ। কারও সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা আপাততঃ আমার নেই। যদি কেউ স্বেচ্ছায় সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা করে, তবে আমাদের আর সংঘর্ষ ভিন্ন কোন উপায় থাকবে না।'(১)

---

(১) আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড ৩ , পৃষ্ঠা - ২৭৩-২৭৫
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠ - ১৫৫-১৫৮
তারীখে তাবরী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা - ২৭৯-২৮৬

কূফার পথে হযরত হুসাইন (রাঃ)

মুসলিম ইবনে আকীল যখন হযরত হুসাইনের নিকট খবর পাঠালেন যে– 'ইতিমধ্যে আঠারো হাজার মুসলমান আপনার নামে আমার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছে। তারা এখন আপনার আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। আপনার নেতৃত্ব গ্রহণের আশায় অপেক্ষমান। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আপনার অনুকূলে। অতএব বিলম্ব না করে এখানে তাশরীফ আনতে পারেন।' তখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফা যাত্রার জন্য মনস্থীর করে ফেললেন, এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলেন। একমাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ব্যতীত সকলেই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে কূফায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন– 'কূফাবাসী বিশ্বাসঘাতক, সুযোগ সন্ধানী, তাদের কোন অঙ্গীকার বা বাইয়া'তের উপর বিশ্বাস করলে ধোকায় পড়তে হবে। আমরা জেনে শুনে আপনাকে এত বড় বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

কূফা যাত্রার সংবাদ শুনে হযরত উমর ইবনে আব্দুর রহমান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে আসেন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন– 'আপনি এমন এক জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, যাদের শাসনকর্তা এখনও বিদ্যমান এবং তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। সাধারণ মানুষ তো অর্থের স্রোতে ভেসে চলতেই অভ্যস্ত। দিনার-দিরহামের তারা পূজা করে। আমার আশংকা হচ্ছে, যারা আপনার নেতৃত্ব গ্রহণের আশায় অপেক্ষা করছে, তারাই আবার আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরে। তাদের অন্তরে আপনার ভালবাসা আছে সত্য, তদুপরি যুদ্ধের ময়দানে প্রকাশ্যে ইয়াযীদের বিরোধিতা করার মত সাহস হয়ত তাদের থাকবে না। আজ যারা আপনার অনুকূলে কথা বলছে, আগামীকাল হয়ত তারাই আবার আপনার বিরোধিতায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আপনার কাছে সুবিনীত আব্দার– 'এই পরিস্থিতিতে আপনি কূফায় না গিয়ে মক্কাতেই অবস্থান করুন।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ সংবাদ শুনে অস্থির হয়ে ছুটে এসে বললেন– 'শুনলাম আপনি কূফায় যাচ্ছেন! সত্যিই কি তাই?'

উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'আপনি ঠিকই শুনেছেন। আজ বা আগামীকালের মধ্যে আমি কূফার পথে যাত্রা করব স্থীর করেছি।'

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'খোদার শপথ! আপনি একটু ভেবে দেখুন! যাদের নেতৃত্ব আপনি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তারা কি ক্ষমতাসীন গভর্ণরকে হটিয়ে শহরে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? পারেনি। পেরেছে কি তারা শত্রু-শক্তিকে পরাস্ত করে তাদের শহর থেকে বের করে দিতে? তাও পারেনি। সেখানে এখনো ইয়াযীদের মনোনীত গভর্ণরই শাসন কার্য পরিচালনা করছে। শহর এখনো আপনার শত্রুদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এমন অবস্থায় আপনার কূফায় গমন, নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর হবে। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে, কূফাবাসী শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে। শত্রুপক্ষের শক্তির পাল্লা ভারী দেখলে তারা আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে দ্বিধা করবে না।'

এর জবাবে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'ঠিক আছে আমি 'ইস্তিখারা' করে দেখব । তারপর যা ভাল মনে হয় তাই করব ।'

দ্বিতীয় দিন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফাভিমুখে যাত্রা করলে পুনরায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছুটে এসে বললেন– 'ভ্রাতা! আমি নীরব থাকতেই চেয়ে ছিলাম, কিন্তু আপনাকে অনিবার্য মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে দেখে স্থীর থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। ইরাকবাসী কথার মর্যাদা দিতে জানে না। বিশ্বাস ভঙ্গ করায় তারা অভ্যস্ত। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনার সেখানে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি মক্কাতেই অবস্থান করুন। এখানে আপনার চেয়ে সম্মানী ও মর্যাদার অধিকারী আর কে আছে? সত্যিই যদি কূফাবাসী অন্তর থেকে নেতা হিসাবে আপনাকে চেয়ে থাকে। তবে আপনি তাদের লিখে জানিয়ে দিন– 'প্রথমে তোমরা ক্ষমতাসীনদের হটিয়ে শহরে তোমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর। তারপর আমাকে জানাও, আমি আসব । আর একান্তই যদি মক্কা

ছেড়ে চলে যেতে চান। তবে কূফায় না গিয়ে ইয়ামানে চলে যান। সেখানে প্রাচীর ঘেরা মজবূত কিল্লা, বিস্তৃত জায়গা এবং দুর্ভেদ্য পর্বতমালার পাশাপাশি আপনার পিতার প্রচুর অনুরাগী রয়েছে। সেখানে শত্রুদের নাগালের বাইরে থেকে যোগাযোগের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আপনি সত্য প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারবেন।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উত্তরে বললেন– 'ইবনে আব্বাস! আমি জানি তোমরা আমার কল্যাণ চাও, আমার মঙ্গল কামনা কর। কিন্তু পূর্বেই আমি আমার সিদ্ধান্ত স্থীর করে ফেলেছি। এখন আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

শেষবারের মত ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'একান্ত যদি আপনাকে যেতেই হয়, তাহলে আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না। তবে মেহেরবানী করে মহিলা ও শিশু-বাচ্চাদের অন্ততঃ সাথে নিয়ে যাবেন না। আমার আশংকা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আপনাকে হযরত উসমান 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মত ছেলে-সন্তানদের সামনে নিহত হতে না হয়।'

দ্বীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অবশেষে হিজরী ৬০ সনের জিলহজ্জ মাসের তিন কারো কারো মতে আট তারিখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কা থেকে কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সময়ে ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োজিত মক্কার গভর্ণর ছিলেন 'আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস। তিনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কূফা যাত্রার সংবাদ শুনে কিছু লোক দিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে নিজের মঞ্জিল পানে দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর নবী (সঃ) ভক্ত, আরবের সুপ্রসিদ্ধ কবি ফারায্‌দাকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়ে গেল। তিনি ইরাক থেকে আসছিলেন, মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে দেখে প্রশ্ন করলেম– 'কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন– 'কূফাবাসীর অবস্থা কেমন দেখে আসলেন?'

উত্তরে তিনি তার কাব্যের ভাষায় বললেন– 'আপনি এমন লোককে জিজ্ঞেস করেছেন– যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কূফাবাসীর ভালবাসার জগতে আপনি 'সম্রাট' হয়ে আছেন। কিন্তু তাদের তরবারী বনী উমাইয়াদের পক্ষেই খাপমুক্ত হয়েছে। মানুষের ভাগ্যের নির্ধারণ হয় উপর থেকে, তা কেউ খণ্ডাতে পারে না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।'

তার কথা শুনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'তুমি সত্যই বলেছ, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলাই সকল ক্ষমতার আঁধার। তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়ে থাকে। তিনি যখন যা খুশী নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। অতএব ভাগ্য যদি আমার অনুকূলে লেখা হয়ে থাকে, তো আল্লাহ'র শোকর। আর তাক্বদীরের ফয়সালা যদি আমার প্রতিকূলে হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তার পরিণাম আমাকে দিবেন।' এ কথা বলে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কূফা যাত্রা সম্পর্কে সংবাদ শুনামাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' একটি চিঠি লিখে নিজের ছেলের মাধ্যমে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট প্রেরণ করলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল–

'আমি আপনাকে আল্লাহ'র দোহাই দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমার এই পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে আপনি মক্কায় ফিরে আসুন। আপনার মঙ্গল কামনা করি বলেই আমি এই পরামর্শ দিচ্ছি। জেনেশুনে আপনি পরিবার-পরিজনসহ নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। খোদা না করুন! আপনার তিরোধানের পর পৃথিবী আঁধারে ডুবে যাবে। বর্তমানে একমাত্র আপনিই আমাদের দিশারী, আমাদের পথ-প্রদর্শক ও আমাদের গর্ব। আপনাকে অবশ্যই এ ব্যাপারে খুব ভেবে-চিন্তে স্থীর মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখনও সময় আছে, বিষয়টি আপনি পুনরায় বিবেচনা করে দেখুন। খুব স্বল্প সময়ের মাঝেই আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসছি।'

এদিকে তিনি মক্কার গভর্ণর আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস-এর নিকট গিয়ে বললেন– 'আপনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে

একটি লিখিত নিরাপত্তানামা পাঠিয়ে দিন, এবং তাতে এ কথাও উল্লেখ করবেন যে, আপনি পুনরায় মক্কায় ফিরে আসলে আপনার সাথে আগের মতই নম্র ও ভদ্রসূলভ ব্যবহার করা হবে।

মক্কার গভর্ণর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পরামর্শ অনুযায়ী নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের ভাই ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদকেও পাঠিয়ে দিলেন। পথে তারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে মিলিত হয়ে গভর্ণরের পত্র দেখিয়ে তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন। বহু পীড়াপীড়ির পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদেরকে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন–

'আমি নানাজানকে স্বপ্নে দেখেছি– স্বপ্নে তিনি আমাকে একটি নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র নানাজানের ঐ নির্দেশটি পালন করার জন্যই আমি সেখানে যাচ্ছি। আর এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আমার উপর যত ঝড় ঝাপটাই আসুক, আমি তা বরদাশ্ত করে যাব ।'

তারা প্রশ্ন করলেন– স্বপ্নের ঐ নির্দেশটি কি আমরা জানতে পারি?'

উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন–

'এ পর্যন্ত আমি সে স্বপ্নের কথা কাউকে বলিনি। ভবিষ্যতেও কাউকে বলার ইচ্ছা আমার নেই এবং আল্লাহ'র কাছে ফিরে যাবার আগে কাউকে আমি স্বপ্নের সে নির্দেশটি বলব না।' (১)

১। আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭৫-২৭৭
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৬-২৯২
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৯-১৬৭
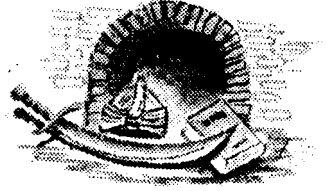
হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রস্তুতি

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কূফা আগমনের সংবাদ ইবনে যিয়াদ জানতে পারল, তখন সে তার সেনাবাহিনী প্রধান হাসীন ইবনে নুমাইরকে কাদেসিয়া পাঠিয়ে দিল যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। এদিকে 'হাজির' নামক স্থানে পৌঁছে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফাবাসীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে কায়স ইবনে মুসহির-এর মারফত পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে তিনি তাঁর কূফায় আগমনের সংবাদ এবং যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কূফাবাসী তাঁকে আসতে বার বার আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা লিখে দিলেন।

কায়স ইবনে মুসহির পত্র নিয়ে কাদেসিয়ায় পৌঁছা মাত্রই ইবনে যিয়াদের সৈন্যরা তাকে বন্দী করে গভর্ণর হাইজের সামনে হাজির করল। ইবনে যিয়াদ কায়সকে গভর্ণর হাউজের ছাদে উঠিয়ে বলল– 'তুমি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালী দাও, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর বা ভর্ৎসনা করে কথা বল। (নাউযুবিল্লা) তাহলে তোমাকে ক্ষমা করে দিব । তোমার কোন শাস্তি হবে না।'

কায়স ছাদের উপর চড়ে হামদ ছানা পাঠ করার পর উচ্চস্বরে দ্রুত এক ভাষণে বললেন– হে কূফাবাসী! বর্তমানে আল্লাহ'র সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি হুসাইন ইবনে আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' বার্তাবাহক হিসাবে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এখন তিনি 'হাজির' নামক স্থানে অবস্থান করছেন। তোমরা তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে যাও।'

অতঃপর তিনি ইবনে যিয়াদকে লক্ষ্য করে ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের ভাষায় অনেক কথা বললেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসের পরিমাণ দেখে ইবনে যিয়াদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল এবং পাষণ্ডের মত নির্দেশ দিল, তাঁকে ছাদ থেকে নীচে

ফেলে দেয়ার। ইবনে যিয়াদের এ নির্দেশ পালন করতে সামান্য হাতও কাঁপল না তার পোষা কুকুর গুলোর। নীচে পড়ে গিয়ে কায়স শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট ছুয়ালেন বড় নিশ্চিন্ত মনে।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' অব্যাহত গতিতে কূফার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুতি নামক এক ব্যক্তির সাথে সক্ষাৎ হলে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনার তরে আমার পিতা মাতা উৎসর্গ হোক। আমি কি জানতে পারি আপনার গন্তব্য কোন দিকে?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' স্বীয় গন্তব্যের কথা জানালে তিনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করলেন–

'হে রাসূল তনয়! আমি আপনাকে আল্লাহ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছিঁ, আপনি আপনার সংকল্প পরিহার করুন। আপনি বনু উমাইয়াদের থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনার সংকল্প ত্যাগ করুন। নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা আপনাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না। ক্ষমতার লোভে তারা পারে না এমন কোন কাজ নেই। আল্লাহ'র শপথ! তাদের হাতে আপনি নিহত হলে পৃথিবীতে তাদের দৌরাত্ব আরো শত গুণে বেড়ে যাবে। তাদের হুঁশিয়ার করার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব আর খোঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর কারো কথায় তারা তোয়াক্কা করার প্রয়োজন বোধ করবে না। আপনার 'বাঁচা মরা'র উপর নির্ভর করছে আরব তথা মুসলিম বিশ্বের মান মর্যাদার অস্তিত্ব। উমাইয়াদের হাতে আপনার মহামূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিবেন না।' কিন্তু হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তার কথায় প্রভাবিত না হয়ে কূফার দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের অছিয়ত অনুযায়ী মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ যে পত্র পাঠিয়েছিল, তা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পৌঁছলে তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের মর্মান্তিক শাহাদাতের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

এই হৃদয় বিদারক ঘটনার সংবাদ জানতে পেরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথী-সঙ্গীরা পরামর্শ দিলেন– 'এই নাজুক পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়াটাই আমাদের জন্য সবদিক থেকে ভাল হবে। কূফায় এখন আর আমরা কোন সাহায্যকারী পাব না। হাওয়া এখন আমাদের প্রতিকূলে বইছে। যারা আমাদের আগমনের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তারাই এখন খোলা তরবারী হাতে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে।'

কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের আত্মীয়-স্বজন ইস্পাত দৃঢ় মনোবল নিয়ে বললেন– 'আল্লাহ'র শপথ! আমরা মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ঘরে ফিরব না। এতে যদি আমাদের জীবন চলে যায়, তাতে আমাদের কোন পরোয়া নেই। যে কোন মূল্যে এ হত্যার প্রতিশোধ আমরা নেব-ই।'

পরিস্থিতির নিরিখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন– তিনি যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ বিপদ সংকুল পথে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, তা সফল হওয়ার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের করুণ ও মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অবিচলতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা দেখে তিনি বললেন– 'এখন আর জীবনের মায়ায় ফিরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কি হবে এই লাঞ্ছনাকর জীবন রেখে?'

এ সময় সাথীদের কয়েকজন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে এই বলে উৎসাহিত করল যে–আপনার সাথে মুসলিম ইবনে আকীলের তুলনা চলে না। কূফাবাসী মুসলিমের সাথে যে চরম দুর্ব্যবহার করেছে, সে ব্যবহার আপনার সাথে করার সাহস তাদের কোন দিনই হবে না। আপনার মান-মর্যাদা আর 'ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তারা আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

যাবতীয় কারণে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বিরামহীন গতিতে কূফা অভিমুখে এগিয়ে চললেন। 'যুবালা' নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করলেন। পথে বিভিন্ন স্থান থেকে লোক এসে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সফরসঙ্গী হতে লাগল। আর এতে ধীরে ধীরে কাফেলার লোক সংখ্যা

বৃদ্ধি পেতে লাগল। যুবালাতেও কিছু লোক এসে তাঁর সাথে কাফেলায় শরীক হল।

এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সকলের সামনে কূফার ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ রাখলেন। ভাষণে তিনি বললেন–

'হে আল্লাহ'র পথের সৈনিকগণ! কূফাবাসী আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। সেখানকার যেসব লোক আমার নামে শপথ নিয়েছিল, যারা তাদের নেতৃত্বভার নেয়ার জন্য আমাকে বার বার আহ্বান করেছিল, যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল, তারাই আজ ইয়াযীদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। শহীদ করেছে মুসলিম ইবনে আকীল ও হানীসহ কয়েকজন খাঁটি মু'মীন মুসলমানকে। এখন সেখানে আর আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে কেউ এগিয়ে আসবে না বরং খোলা তরবারী হাতে মুকাবিলায় এগিয়ে আসবে। এখন তোমরা ভেবে দেখ! যার খুশী আমার সাথে থাকতে পার। আর ইচ্ছা হলে চলেও যেতে পার। আমি কাউকে কিছু বলব না। কারো প্রতি অসন্তোষও প্রকাশ করব না।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এ ভাষণ শুনে পথে এসে যারা যোগ দিয়েছিল, এক এক করে তারা সবাই চলে গেল। শুধু মক্কার সাথীদের নিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এখান (যুবালা) থেকে কিছুদূর চলার পর 'আসাবা' নামক স্থানে পৌঁছে এক আরবীর সাক্ষাৎ পেলেন। আরব্য এই ব্যক্তি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে খোদার শপথ দিয়ে বলল–

'আল্লাহ'র দোহাই লাগে, আপনি মক্কায় ফিরে চলুন। কূফাবাসী খোলা তরবারী, বিষাক্ত তীর আর ধারাল বল্লম নিয়ে আপনাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে। কূফাবাসী তাদের শাসনকর্তাদের নগর থেকে বের করে দিতে পারেনি। পারেনি তাদের হত্যা করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। তারা কিছুই পারেনি। যদি তারা তা পারত , তবে আপনার সেখানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হত । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার জন্য সেখানে যাওয়া মোটেই উচিৎ হচ্ছে না।'

তার কথার উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'তুমি আমাকে যা কিছু বললে, এর একটি কথাও আমার অজ্ঞাত নয়। সবকিছু জানার পরই আমি সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি। ভাগ্যে যা লিখা আছে তা কে খণ্ডাতে পারে? বল!' (১)

হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর মুখোমুখি হুর ইবনে ইয়াযীদ

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সংগী-সাথীদের নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ দিগন্ত রেখায় কুয়াশার ন্যায় ঝাপসা কিছু একটা লক্ষ্য করা গেল। প্রথম নজরে কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু গভীর দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করে বুঝা গেল যে, একদল অশ্বারোহী খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সাথীদের পাশের পাহাড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন। প্রস্তুতি চলছে, এরই মাঝে হুর ইবনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে 'এক হাজার'-এর এক বিরাট অশ্বারোহী সৈন্যদল হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে মুকাবিলা করার জন্য তাঁদের বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করল। ইয়াযীদের সেনাবাহিনী প্রধান হাসীন ইবনে নুমাইর কাদেসিয়া থেকে এই সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিল। উভয় দল প্রস্তুতি নিতে নিতে যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়ে সকলকে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। কিছুক্ষণের ভিতর সকলে নামাযের জন্য এক জায়গায় জমায়েত হয়ে গেল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি কূফায় আগমনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বললেন-

---

১। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৯
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৮-৩০১
আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৩ ,পৃষ্ঠা-২৭৭-২৭৮

'স্বেচ্ছায় আমি এখানে আসিনি। তোমাদের অগণিত চিঠি-পত্র আর বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আহ্বানের প্রেক্ষিতেই এখানে এসেছি। তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে জানান হয়েছে- তোমাদের কোন নেতা নেই। আমাকে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছ বলেই আমার আগমন। এখন যদি তোমাদের মত পরিবর্তন হয়ে থাকে, আমার আগমন যদি তোমাদের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে, তবে তোমরা বল, আমি মক্কায় ফিরে যাই।'

ভাষণ শেষ হলে কেউ কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না। নিশ্চুপ বসে রইল সবাই। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মুয়াজ্জিনকে ইক্কামত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে হুর ইবনে ইয়াযীদকে উদ্দেশ্য করে বললেন- 'তুমি কি তোমার সৈন্যদের নিয়ে পৃথক জামাত করবে, না আমাদের সাথেই নামায পড়বে?'

হুর বলল- 'আমরা আপনার ইমামতিতেই নামায পড়ব ।'

হযরত হুসাইন'রাযিয়াল্লাহু আনহু' নামাযের ইমামতি করলেন। উভয় পক্ষই তাঁর পিছনে নামায আদায় করল। নামাযের পর সবাই নিজ নিজ শিবিরে চলে গেল। অতঃপর আছরের নামাযের ইমামতিও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' করলেন।

নামায শেষে সকলকে উদ্দেশ্য করে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি এখানে আসার যাবতীয় কারণ উল্লেখ করে খলীফা নির্বাচন ও খেলাফত পরিচালনার সত্যিকার হক্বদার কে? ইত্যাদি বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করলেন।

এসময় হুর ইবনে ইয়াযীদ বলে উঠল- 'আপনার নিকট চিঠি-পত্র প্রেরণ সম্পর্কিত কোন খবর আমাদের জানা নেই।'

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' চিঠিতে পরিপূর্ণ দুটো থলে বের করে তাকে দেখালেন।

পত্র দেখে হুর বলল- 'পত্র প্রেরণকারীদের মাঝে এখানে আমাদের কেউ নেই। আমার উপর কূফার গভর্ণর ইবনে যিয়াদের নির্দেশ রয়েছে, আপনাকে তার গভর্ণর হাউজে উপস্থিত করতে হবে। আমি তার নির্দেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর। এখন যদি আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে যেতে রাজি না হন,

তবে আমিও আপনার পিছু ছাড়তে রাজি নই।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি আমাকে ইবনে যিয়াদের নিকট হাজির করতে পারবে না।'

অতঃপর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করে সঙ্গীদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হুর ইবনে ইয়াযীদ বাধা হয়ে দাঁড়াল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন– 'তুমি আমার পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা কর না। বল তো, তোমার ইচ্ছা কি? তুমি কি করতে চাও?'

উত্তরে হুর বলল– 'আমি চাই আপনাকে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে যেতে।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– আমি আগেই বলেছি– 'তোমার সাথে আমি তার কাছে যাব না।'

হুর উত্তর দিল– 'আমিও আপনার পিছু ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনাকে তার সামনে উপস্থিত করতে পারব।'

এমনিভাবে দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির এক পর্যায় হুর বলল– 'আপনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ আমি পাইনি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনাকে কূফায় উপস্থিত করানোর জন্য। যতক্ষণ তা না পারব ততক্ষণ আপনার পিছে লেগে থাকতে হবে আমাকে।

অতএব আপনি মক্কা বা কূফার পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পথে অগ্রসর হোন। আপনার লক্ষ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে আমি ইবনে যিয়াদের কাছে চিঠি লিখছি। আপনিও চিঠি লিখে বিষয়টি ইবনে যিয়াদ কিংবা ইয়াযীদের কাছে জানিয়ে দিন। এ পথে এগুলে হয়ত আল্লাহ্ এমন কোন পথ বের করে দিবেন, যার মাধ্যমে আপনার সাথে মুকাবিলা করে আপনাকে কষ্ট দেয়ার হাত থেকে আমি বেঁচে যাব।'

তার পরামর্শ মেনে নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' 'আযীব' এবং 'কাদেসিয়া'র রাস্তাকে পাশ কাটিয়ে বাম দিকে যাত্রার মোড় ঘুরিয়ে

দিলেন। হুর তার সেনা বাহিনীসহ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সাথে চলতে শুরু করল।

এই সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' শত্রু মিত্র সকলকে উদ্দেশ্য করে নসীহত সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি কূফার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে ইয়াযীদ ও তার শাসক গোষ্ঠির অন্যায় ও জুলুমের চিত্র তুলে সকলকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানালেন।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভাষণ শুনে হুর ইবনে ইয়াযীদ বলল– 'আমি আপনাকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আপনার জীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিবেন না। কারণ আমার প্রবল আশংকা হচ্ছে, আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে আপনাকে শহীদ করা হবে।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' রাগত স্বরে বললেন, তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ? তোমরা কি আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছ?'

হুর ইবনে ইয়াযীদের অন্তরে নবী-পরিবার তথা আহলে বাইতের সম্মান আর শ্রদ্ধা ছিল পরিপূর্ণ। সে আর কথা না বাড়িয়ে পৃথক হয়ে গিয়ে দূর থেকেই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনুসরণ করতে লাগল।

এদিকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সহযোগিতার জন্য 'তারাম্মাহ ইবনে 'আদী'র নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এসে কাফেলার সাথে শরীক হল। হুর ইবনে ইয়াযীদ প্রথমে তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হুমকীর মুখে হুর তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদের কাছে কূফাবাসীর অবস্থা জানতে চাইলে, তারা জানাল-

'সরকারী কোষাগারের অর্থ দিয়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ইবনে যিয়াদ কিনে নিয়েছে। এখন তারা আপনার প্রতিপক্ষের সহযোগিতা করতে সংকল্পবদ্ধ। জন সাধারণের অন্তরে আপনার ভালবাসা থাকলেও তাদের তরবারী আপনার বিরুদ্ধেই কথা বলবে। আমরা আসার সময়ও আপনার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য অনেক লোককে প্রস্তুতি নিতে দেখে এসেছি। কারো মুকাবিলায় ইতিপূর্বে এত অধিক সংখ্যক লোক আমরা কখনো দেখিনি।

খোদার কসম! আপনি আর এক পা সামনে অগ্রসর হবেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা আপনাকে 'আযা' নামক পর্বতমালায় নিয়ে যাব। সেখানে আপনি সংরক্ষিত কিল্লার ভিতর বসবাস করতে পারবেন। শত্রুরা আপনার নাগাল পাওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না। শত্রুর হামলা রুখতে আমরা সাধারণতঃ এই পাহাড়কেই ব্যবহার করে থাকি। এখানেই আশ্রয় নিয়ে থাকি। আপনি সেখানে অবস্থান করে 'তাই' গোত্রের লোকদের সমবেত হওয়ার আহ্বান করুন। খোদার শপথ! দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই এ গোত্রের লোকেরা সর্বান্তকরণে আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তখন যদি আপনি বর্তমান সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তবে আমরা আপনাকে বিশ হাজার সাহসী বীর যোদ্ধা যুগিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি। বীরত্বের নিপুণতা প্রদর্শন করে তারা আপনাকে মুগ্ধ করে দিবে। দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তারা আপনার গায়ে সামান্য আচড় দেয়ার সুযোগও শত্রুপক্ষকে দিবে না।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'আল্লাহ তোমাদের গোত্রের লোকদের মঙ্গল করুন। যেহেতু আমার এবং হুর ইবনে ইয়াযীদের মাঝে একটি চুক্তি হয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই চুক্তি ভঙ্গ করা সম্ভব হবে না। আমাদের শেষ পরিণাম সম্পর্কে এখনো আমি কিছুই বলতে পারছি না।'

এ কথা শুনে তারাম্মাহ ইবনে 'আ'দী সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পুনরায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাফেলার সাথে যোগ দেয়ার ওয়াদা করে বিদায় নিল। পরবর্তীতে ওয়াদা মুতাবেক সে এসেছিল। কিন্তু হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মিথ্যা শাহাদাতের সংবাদ শুনে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

এমনি পরিস্থিতির ভিতর একদিন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হঠাৎ তন্দ্রা থেকে জেগেই বলে উঠলেন– 'ইন্নালিল্লাহ!' এ সময় তাঁর পাশেই ছিলেন ছেলে আলী আকবর। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'আব্বাজান! আমাদের জন্য কি কোন দুঃসংবাদ আছে?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'আমি স্বপ্নে দেখতে [illegible] দ্রুতগতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে, আর

বলছে– 'কিছু লোক সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের মৃত্যুও তাদের সাথে সাথেই অগ্রসর হচ্ছে।' এতে আমি এই বুঝেছি যে, আমাদের মৃত্যু অতি নিকটে।'

আলী আকবর বললেন– 'আব্বাজান! আমরা কি তবে সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নই?' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ'র শপথ! নিঃসন্দেহে আমরা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।'

তা শুনে আলী আকবর বললেন– 'তবে আর আমাদের ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? সত্যের পথে থেকে শাহাদাত বরণের চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছেলের সৎ সাহসের প্রশংসা করে বললেন– 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তুমি তোমার পিতার পরিপূর্ণ হক্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছ।' (১)
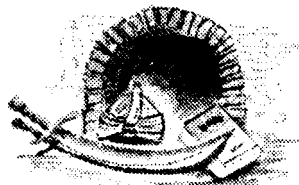
কারবালার ময়দানে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে 'নাইনুবী' নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন। তখন কূফা থেকে একজন অশ্বারোহী খুব দ্রুতগতিতে এসে হুর ইবনে ইয়াযীদকে সালাম করল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করার প্রয়োজনটুকু সে অনুভব করল না। সে হুরের নিকট ইবনে যিয়াদের একটি পত্র হস্তান্তর করল। যার বিষয় বস্তু ছিল এমন–

'এ পত্র তোমার হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে হুসাইনের চলার গতি সংকীর্ণ করে দিবে। খোলা মরুভূমি, যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা থাকবে না, এমন স্থান ছাড়া তাকে কোথাও শিবির স্থাপনের সুযোগ দিবে না। আমার

---

(১) আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৭৯-২৮২
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০১-৩০৮
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৪

নির্দেশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত পত্রবাহক তোমার সাথেই থাকবে। সে তোমার গতি-বিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।'

হুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ইবনে যিয়াদের পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে অবগত করানোর পর নিজের অপারগতা প্রকাশ করে বলল–

'এখন আমার পিছনে গুপ্তচর লেগে আছে। আপনার সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহারের অবকাশ আর আমি পাব না।'

এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে উদ্দেশ্য করে তাঁর এক সাথী বললেন–

'আপনি দেখছেন, প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের সমস্যা শুধু বেড়েই চলছে। এমন পরিস্থিতিতে এই এক হাজার সৈন্যের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয়াটাই কি আমাদের জন্য ভাল হত না?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'আমি চাইনা আমার দ্বারা যুদ্ধের সূচনা হোক।'

সঙ্গী বলল– 'যদি তা নাই চান, তবে আমাদেরকে নিয়ে সামনে ফোরাত নদীর তীরে ঐ বস্তিতে চলুন। বস্তিটি আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তারা যদি আমাদের সে স্থানে যেতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, তখন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব ।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বস্তিটির নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, তার নাম 'আকর'। নাম শুনার সাথে সাথে বললেন– আমি 'আকর' থেকে পানাহ্ চাই। (আকর-এর শাব্দিক অর্থ হল, ধ্বংস।)

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ বিষয় নিয়ে সাথী-সঙ্গীদের সাথে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় উমর ইবনে সা'আদের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হল। উমর ইবনে সা'আদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারছিলেন না। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ইবনে যিয়াদ তাকে এক

প্রকার জোর করেই এ কাজে প্রেরণ করেছে। আন্তরিকভাবেই তিনি সব সময় চাচ্ছিলেন, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব যেন তার কাঁধে না বর্তায়। এ বিপদ থেকে তিনি মুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইবনে যিয়াদ তার কোন আপত্তিই কানে তুলেনি।

উমর ইবনে সা'আদ এখানে পৌছে প্রথমে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তার কূফায় আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি কূফায় আগমনের পুরা প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বললেন–

'আমি স্বেচ্ছায় এখানে আগমন করিনি । এখানে আসার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান হয়েছে। এখন যদি অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে আমি ফিরে যেতে প্রস্তুত রয়েছি।'

উমর ইবনে সা'আদ তৎক্ষণাৎ ইবনে যিয়াদের নিকট পত্র লিখে পাঠালেন যে– 'হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তন করতে রাজী আছেন।'

তার পত্রের উত্তরে ইবনে যিয়াদ লিখে পাঠাল যে– 'হুসাইনের জন্য এখন কেবলমাত্র একটি পথই খোলা আছে। আর সেটি হল– ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা। যদি হুসাইন ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') ইয়াযীদের হাতে বাই'আত নিতে সম্মতি জানায়, তবে আমরা ভেবে দেখব পরবর্তীতে তাঁর সাথে কি আচরণ করা যায়।' ইবনে যিয়াদ পত্রে আরও লিখে দিল যে– 'হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং তাঁর সাথী সংগীরা পানি থেকে যেন পুরোপুরি বঞ্চিত থাকে।'

তখন মুহররম মাসের ৭ তারিখ। ইবনে যিয়াদের উত্তর পেয়ে উমর ইবনে সা'আদ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং নির্দেশ মুতাবেক হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও তাঁর সাথী-সংগীদের থেকে পানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদের এ ব্যবহারে ভীষন আঘাত পেলেন।

এক সময় কাফেলার প্রত্যেকের জমান পানি নিঃশেষ হয়ে গেল। তরুলতা বিহীন আরব মরুভূমি, উপরন্ত সুর্যের প্রখর তাপে পানির তৃষ্ণায়

ছোট ছোট শিশু-বাচ্চারা ছটফট করতে লাগল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নিজের ভাই আব্বাছ ইবনে আলী'কে ত্রিশজন অশ্বারোহী এবং ত্রিশজন পদাতিকের এক বাহিনী সাথে দিয়ে ফোরাত থেকে পানি আনতে পাঠালেন। উমর ইবনে সা'আদের সৈন্য বাহিনীর সাথে তুমুল সংঘর্ষ করে শেষ পর্যন্ত বিশ মশক পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন।

অতঃপর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উমর ইবনে সাআদের সাথে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য পয়গাম পাঠালেন। পয়গামে তিনি এও জানিয়ে দিলেন– 'আজ রাতের মধ্যেই আমাদের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। কালক্ষেপনে উভয় পক্ষেরই লোকসান।'

পয়গাম মুতাবেক রাতের বেলায় উমর ইবনে সা'আদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে মিলিত হলেন। হযরত হুসাইন এবং উমর ইবনে সা'আদ-এর মাঝে সুদীর্ঘ আলোচনার পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উমর ইবনে সা'আদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব তিনটি ছিল নিম্নরূপ–

একঃ– যে স্থান থেকে এসেছি সে স্থানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমাকে দেয়া হোক। অথবা

দুইঃ– সরাসরি ইয়াযীদের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক। অথবা-

তিনঃ– আমাকে যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক। সেখানকার সর্ব সাধারণ আমাকে যেভাবেই গ্রহণ করবে, আমি তাদের সাথে সেভাবেই বসবাস করব ।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে উমর ইবনে সা'আদ একটি পত্র পঠিয়ে দিলেন ইবনে যিয়াদের নিকট। পত্রের বিষয় বস্তু ছিলো–

'আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধের ডামাডোল থামিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের ভিতর আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই চরম সংকটময় মুহূর্তে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'

আমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। এর যে কোন একটি অবলম্বনের মাধ্যমে আমাদের সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। যার ফলে মুসলমানরা মান-মর্যাদার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।'

উমর ইবনে সা'আদের পত্র ইবনে যিয়াদের উপর অনেকটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হল। সে বলল– এই পত্র এমন এক ব্যক্তির, যে নেতার আনুগত্য স্বীকার করে জাতির ভিতর ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি তার এ প্রস্তাবকে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু বিধি হল বাম। এই শুভ মুহূর্তে শিমার ইবনে ঝিল-জাওশাসন এই ঐক্য প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। প্রস্তাবটি অনুমোদনের ঘোর বিরোধিতা করে সে বলল–

'হুসাইনকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেয়া বা সুযোগ দেয়া কোনটাই ঠিক হচ্ছে না। পরিণতিতে আমাদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই প্রকট। আজ তার অর্থ ও জনবল কম। কিন্তু সুযোগ পেলে দু'দিন পর সে শক্তি অর্জন করে আপনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তখন তার সাথে কুলিয়ে উঠা আপনার সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। তাই সময় থাকতে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেয়ার আরজি পেশ করছি। আমি শুনেছি রাতের অন্ধকারে উমর ইবনে সা'আদ ও হুসাইন (রাঃ)-এর মাঝে গোপন বৈঠক চলে। আমার বিশ্বাস তারা উভয়ে হাত মিলিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। অতএব আপনি এ প্রস্তাব অনুমোদন না করে যে কোন উপায়ে হুসাইন (রাঃ)-কে আপনার নিকট উপস্থিত হতে বাধ্য করুন। তারপর তাকে শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করে দেয়ার কথা বিবেচনা করা যাবে। অন্যথায় পরে আপনাকে এজন্য চরম মাশুল দিতে হবে।

শিমারের প্ররোচনায় ইবনে যিয়াদের মন বিগড়ে গেল। তাই সে শিমারের পরামর্শ মত উমর ইবনে সা'আদের নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করল–

'আমি তোমাকে যুদ্ধ এড়িয়ে নতুন কোন পন্থা অবলম্বন করে হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিনি। কিংবা আমি তোমাকে এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি হুসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ নিয়ে তার হয়ে আমার

কাছে সুপারিশ পেশ করবে। তার সঙ্গীরা যদি আমার সাথে কোন চুক্তিতে আসতে চায় অথবা সাক্ষাতে আমার সাথে কথা বলতে চায়, তবে তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে আমার নিকট পৌঁছে দিবে। আর যদি তারা আমার নিকট আসতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে কালবিলম্ব না করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাবে। যুদ্ধে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ বিকৃতি সাধন করে (নাক কান কেটে) তোমাদের ঘোড়ার পায়ের নীচে তাদেরকে মাটির সাথে পীশে মারবে। এটাই শুধু তাদের প্রাপ্য। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরই তারা যোগ্য। আমার এ নির্দেশ যথাযথ পালন করতে পারলে অজস্র পুরস্কার তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর যদি আমার এ নির্দেশ পালনে তোমার কোন ধরনের সংকট বা দ্বিধা থাকে, তবে পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথেই তুমি সেনাপতির দায়িত্ব শিমারের হাতে অর্পণ করে সৈন্য থেকে পৃথক হয়ে যাবে।'

ইবনে যিয়াদ পত্রটি শিমারের মাধ্যমেই প্রেরণ করল। যাত্রার প্রাক্কালে শিমারের স্মরণ হল যে, হেযাযের কাফেলাটির সাথে তার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনও এসেছে। তাদের জীবন রক্ষার স্বার্থে সে ইবনে যিয়াদ থেকে তাদের জন্য নিরাপত্তানামা লিখিয়ে নিল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে প্রথমে সে নিরাপত্তানামাটি আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করল। কিন্তু এই নিরাপত্তানামা দেখে ক্রোধে ক্ষোভে তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন-

'আমাদের জীবন বাঁচাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসেছ? তোমার লজ্জা থাকা উচিত যে, শুধু আত্মীয়দের বাঁচাতে তুমি যে নিরাপত্তানামা নিয়ে এসেছ,সেখানে তাদের নেতা, রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নয়নমণির নিরাপত্তার কোন কথা উল্লেখ নেই। ধিক! তোমার এই লাঞ্ছনাকর নিরাপত্তার। আল্লহর লা'নত তোমার উপর এবং এই অভিশপ্ত নিরাপত্তার উপর। তোমার নিরাপত্তার সামান্যতম প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন শুধু আল্লহ'ই। অন্য কারো দেয়া নিরাপত্তায় আমরা বিশ্বাস করি না।'

শিমার পত্র নিয়ে যখন উমর ইবনে সা'আদের নিকট পৌঁছল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এসব কিছুই শিমারের চক্রান্তে সম্পাদিত হয়েছে। উমর ইবনে সা'আদ শিমারকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

'শিমার! তুমি হয়ত ভাবতেও পারবে না যে, কত ভয়াবহ ও মারাত্মক একটি ক্ষতির দ্বার তুমি উন্মোচন করে দিলে। মুসলমানদের ভিতর কত বড় একটি ঐক্যের ভীতকে তুমি চুরমার করে দিলে এবং নতুন করে মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে কলহ-দ্বন্দের আগুনকে উস্কে দিলে। নিশ্চিত হত্যাযজ্ঞের দিকে তাদের ঠেলে দিলে।'

অবশেষে যখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ইবনে যিয়াদের এই নির্দেশ নামার কথা জানান হল, তখন তিনি ইবনে যিয়াদের প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'এ অপমানের পূর্বে আমার মৃত্যু হওয়াই হবে উত্তম।' (১)

শাহাদাতের পূর্বের ঘটনা

মুহররমের নয় তারিখ যুদ্ধের দামামা বাজার অপেক্ষায় সবাই প্রহর গুনছে। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে বসেই ঝিমুচ্ছিলেন। এই ঝিমুনির মাঝেই তিনি হঠাৎ উচ্চস্বরে আওয়াজ করে উঠলেন। তার পাশেই বসা ছিলেন বোন যয়নব। আওয়াজ শুনে তিনি দৌড়ে এসে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন–

'এই মাত্র আমি নানাজানকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'হে হুসাইন! তুমি কিছুক্ষণের মাঝে আমার সাথে এসে শামিল হতে যাচ্ছ।'

এ কথা শুনে যয়নব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাকে শান্তনা দিচ্ছিলেন। এমনি সময় শিমার তার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভাই

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা -২৮২-২৮৪
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ী, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৭৪ - ১৭৬
তারীখে তাবরী, খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা - ৩০৯ - ৩১৫

আব্বাস অগ্রসর হয়ে তাদের অভিপ্রায় জানতে চাইলে শিমার ঘোষণা করল– 'তোমাদেরকে আর সময় দেয়া হবে না। এখন থেকেই তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে।'

হযরত আব্বাস এসে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে এ সংবাদ জানালে তিনি বললেন– 'তাদেরকে বল– আজ আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। অন্ততঃ একদিনের জন্য হলেও যেন তারা যুদ্ধ পিছিয়ে দেয়। কারণ, অছিয়ত করতে ও নিজেদের গোনাহের জন্য আল্লাহ'র দরবারে কান্নাকাটি করতে আমাদের অন্ততঃ একটি রাতের প্রয়োজন। এই রাতে আমরা আল্লাহ'র নিকট ক্ষমা চেয়ে পাপ মুক্ত হতে চাই।'

শিমার এবং উমর ইবনে সা'আদ সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সেদিনকার মত যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণা করলে সৈন্যরা নিজ নিজ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করল। এই সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আহলে বাইতসহ সকল সাথীদের একত্রিত করে এক ভাষণ দিলেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন-

'হে আল্লাহ! তুমি নবীর বংশে জন্ম দিয়ে আমাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছ, তার শোকর আদায় করার ভাষা বা ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমাকে সুখে রাখ বা দুঃখে রাখ , সর্বাবস্থায় আমি আমার সাধ্যমত তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আমাদের উপর তোমার অসংখ্য করুণা । তুমি আমাদের চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছ বলেই আমরা তোমার পবিত্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। প্রভু হে! তুমি তোমার মনোনীত বান্দাদের কাতারে আমাদের শামিল করে নাও।' তার পর তিনি আরও বললেন–

'এই মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে আমার সাথীদের চেয়ে অধিক আত্মত্যাগী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। আমি জানিনা বর্তমান সময়ে আমার পরিবার-পরিজনের মত এমন দুরাবস্থায় পৃথিবীর অন্য কোথাও কোন পরিবার সময় কাটাচ্ছে কিনা? হে আল্লাহ আজ যারা নিজেদের প্রাণের মায়া ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে তোমার আওয়াজ পৃথিবীর বুকে বুলন্দ রাখার লক্ষ্যে আমার পক্ষ হয়ে অস্ত্র চালাতে প্রস্তুত, তাদের তুমি হিম্মত দাও, সাহস ও শক্তি দাও।

উত্তম প্রতিদানে তাদের কর তুমি পুরস্কৃত।

বন্ধুগণ! আমার মন বলছে, আগামী কালই তাদের সাথে আমাদের চূড়ান্ত ও শেষ ফায়সালা হয়ে যাবে। তাই আমি স্বেচ্ছায় ও খুশী মনে তোমাদের বলছি, পূর্ব আকাশে আগামী ভোরের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর। নিজেদের ইচ্ছা মত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। দিনের আলোতে সে সুযোগ আর তোমরা হয়ত পাবে না। আর যদি সম্ভব হয়, তাহলে তোমাদের সাথে আমার পরিবারের একজন করে সদস্যকে নিরাপদ দূরুত্বে সরিয়ে নিয়ে যাও। কারণ দুশমনরা শুধু আমাকেই চায়। আমাকে পেলে তারা তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এই মর্মস্পর্শী ভাষণ শোনার পর সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন– 'খোদার শপথ! নিজের জীবনের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে শত্রুর হাতে আপনাকে তুলে দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর মত হীন, নিকৃষ্ট ও জঘন্য মানসিকতা আমাদের নেই। এমন লাঞ্ছনাকর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু আমাদের কাছে অনেক শ্রেয়। এমনিভাবে জীবণ ধারনের সামান্যতম স্পৃহাও আমাদের নেই।'

এরপর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মুসলিম ইবনে আ'কীলের আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে বললেন– 'যথেষ্ট। তোমরা সকলে ফিরে যেতে পার। আমি খুশী মনেই তোমাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি।'

উত্তরে তারা বলল– 'যখন মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করবে, রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র কলিজার টুকরাসহ তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তোমারা কি করে চলে আসলে? তখন আমরা তাদের কি বলব ? মুখ লুকানোর জায়গাও তো তখন আমরা খুঁজে পাব না। আপনার সাথে আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গেছে। আমারা জেনে শুনেই এই বিপদসংকুল পথে আপনার সঙ্গী হয়েছি। আমাদের শরীরে একফোটা রক্ত অবশিষ্ট থাকতে আমরা আপনাকে একা এখানে রেখে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে আপনার সামান্য ক্ষতিও সহ্য করব না। আপনার শরীরে শত্রুর সামান্য আঁচড়েরও আমরা বদলা নিব । বদলা

আমাদের নিতেই হবে।'

একে একে সবাই এই মত প্রকাশ করে মনের দৃঢ়তা প্রকাশ করল। এ সময় হযরত যয়নব ব্যথাতুর মন ও ব্যাকুল হৃদয়ে কান্না শুরু করলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে হযরত হোসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এই অছিয়ত করেন–

'আল্লাহ'র দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে অছিয়ত করে যাচ্ছি, আমার শাহাদাতের পর শোকে মুহ্যমান হয়ে কাপড় ছিঁড়া, মাতম করা, উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করার মত যাবতীয় শরীয়ত গর্হিত কাজ কঠোরভাবে বর্জন করবে।' (১)

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথেই বলতে হয়। যারা আজ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আশেক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। তাঁর প্রতি গভীর প্রেম ভালবাসার যারা দাবী করে। তারাই আজ এ সকল জঘন্য কাজগুলোকে দ্বীনের অঙ্গ মনে করে খুব ঘটা করে পালন করে যাচ্ছে। বস্তুতঃ তারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সর্বশেষ অছিয়তের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে যাচ্ছে। আফসোস হয় তাদের উপর, তাদের বোধ বুদ্ধির উপর, লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে তাদের কার্যকলাপ দেখে।

এই অছিয়তের পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে আল্লাহ'র দরবারে দোয়া ও ইসতেগফারে মনোযোগী হলেন। আল্লাহ'র দরবারে কান্নাকাটির ভিতর দিয়েই তাঁরা মুহররমের নয় তারিখ দিবাগত রাত পুরোটাই কাটিয়ে দিলেন।

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৮৪ -১৮৬
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা- ৩১৫ - ৩১৯
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৭৬ -১৭৮
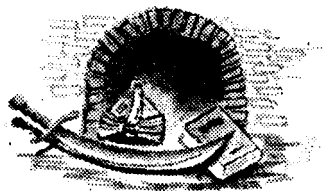
কারবালার রণাঙ্গণ

দশই মুহররম শুক্রবার মতান্তরে সোমবার ফজরের নামাযের পর উমর ইবনে সা'আদ সেনাবাহিনী নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মুখোমুখি হলেন। এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সর্বমোট সাথী-সঙ্গী ছিলেন বাহাত্তরজন। এদের মাঝে মাত্র বত্রিশজন ছিলেন অশ্বারোহী,বাকী সবাই পদাতিক। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

উমর ইবনে সা'আদ তাঁর সেনাবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। হুর ইবনে ইয়াযীদও একদলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে নামল। হুর ইবনে ইয়াযীদের অন্তরে নবী বংশের প্রেম ভালবাসার অংকুর গজিয়ে ছিল পূর্ব থেকেই। তার বাধা দানের কারণে পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। নবী পরিবারের বর্তমান দুর্দশার সমস্ত দোষের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে কিঞ্চিৎ প্রতিকারের আশায় সে ঘোড়া চালিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাফেলার সাথে মিলে গেল। নিজের প্রাথমিক ক্রটির জন্য হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ক্ষমা চেয়ে বলল–

'আমি ভুলবশতঃ আপনার প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যার অশুভ পরিণতি আজ আমাকে দেখতে হচ্ছে। খোদার শপথ! আমি কখনও বুঝতে পারিনি, আপনার সাথে এহেন জঘন্য আচরণ করার দুঃসাহস এরা দেখাবে। আমি ভাবতেও পরিনি আপনার সকল প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করবে। এমন হবে তার সামান্য আঁচও যদি আমি আগে করতে পারতাম, তাহলে আপনাকে আটকিয়ে রাখার মত বোকামী আমি কখনও করতাম না। জানি আমার এ ভুল শোধরানোর সময় আর নেই। তীর হাত থেকে ফস্‌কে গেছে। হাজারো প্রচেষ্টা করে দ্বিতীয়বার

তা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তবে সামান্য প্রতিকারের আশায় এখন আমি আপনার কাতারে শামিল হয়েছি। কৃতকর্মের তওবার উদ্দেশ্যে আমি আপনার পক্ষ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে জীবন উৎসর্গ করতে চাই।'

ইতিমধ্যে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' অশ্বে আরোহণ করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন–

'হে লোক সকল! তাড়াহুড়া না করে আমার কথা মনযোগ দিয়ে শুন। আমি তোমাদের কিছু নসীহত করে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাই এবং তোমাদের জানিয়ে যেতে চাই, আমি কেন এখানে এসেছিলাম। এমন সময় শিবিরে অবস্থানরতা মহিলাগণ নিজেদের আর স্থীর রাখতে না পেরে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। তখন তিনি ভাই আব্বাসকে শিবিরে পাঠালেন তাদের শান্ত করার জন্য এবং বললেন–

'আল্লাহ তা'আলা ইবনে আব্বাসকে ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') দীর্ঘজীবি করুন। তিনি আমায় সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মেয়েদের সাথে নিবেন না।'

শিবিরের ভিতর মহিলাগণ শান্ত হয়ে গেলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি বললেন–

'হে লোক সকল! তোমরা আমার ধমনিতে প্রবাহমান রক্তের কথা ভেবে দেখ তো! আমি কে? তোমাদের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখ! আমাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য কতটুকু সমীচিন হবে? আমার মর্যাদাহানী কি তোমাদের জন্য সুখ বয়ে আনবে? এমন ভেবে থাকলে তোমরা মারাত্মক ভুলের মাঝে আছ। আমি তো তোমাদের নবী কন্যা হযরত ফাতিমা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'-এরই গর্ভজাত সন্তান। আমি তো রাসুলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র চাচাত ভাই শেরে খোদা হযরত আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'রই পুত্র। 'সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা' হযরত হামযা 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আমারই পিতার চাচা ছিলেন। হযরত জা'ফর তাইয়্যার 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছিলেন আমার আপন চাচা। প্রসিদ্ধ সেই হাদীসটি কি তোমারা কোনদিন শুনোনি? যাতে আমাদের

দু'ভাই সম্পর্কে নানাজী বলেছেন– 'জান্নাতের যুব সমাজের সর্দার হবে, হাসান ও হুসাইন।' অন্যত্র তিনি বলেছেন– 'এরা উভয়ই সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের নয়নমণি।'

আমার এ কথাগুলো তোমরা নির্বিঘ্নে বিশ্বাস করতে পার। খোদার শপথ! আমার প্রতিটি কথাই সত্য এবং নিশ্চয়ই সত্য। কারণ 'মিথ্যা কথায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন' এ কথা জানার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন দিন আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হলে এখনও তোমাদের মাঝে এমন লোক আছেন, যাঁদের নিকট এর সত্যতা যাঁচাই করতে পার।

জিজ্ঞাসা কর জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে, আবু সাঈদ অথবা ইবনে সা'আদ 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'কে, জিজ্ঞাসা কর যায়েদ ইবনে আরকাম অথবা হযরত আনাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'কে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে বলবেন যে, এ কথাগুলো তাঁরা রাসুলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' থেকে শ্রবণ করেছেন।

আমার এ কথাগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয়ার পরও কি তোমরা পারবে আমাকে হত্যা করতে? তোমরা আমাকে বল, আমি কি কাউকে হত্যা করেছি? যে প্রতিশোধের তাড়নায় তোমরা আমাকে রক্তের স্রোতে বইয়ে দিতে চাচ্ছ? আমি কি তোমাদের কারো ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁকিয়েছি, যার ফলশ্রুতিতে তোমরা আমার সাথে এমন আচরণ করছ?'

এরপর তিনি কূফার শীর্ষস্থানীয় সর্দারদের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'হে শীশ ইবনে রুবাঈ! হে হাজ্জার ইবনে আব্হুর! হে কাইস ইবনে আশ'আস! হে যায়েদ ইবনে হারেস! তোমরা কি আমাকে কূফায় আগমনের অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখনি?'

তারা সকলে অস্বীকার করে বলল– 'আমরা আপনার নিকট কোন পত্র লিখি নাই।' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'অবাক লাগে

তোমাদের উত্তর শুনে। এখনও আমার নিকট তোমাদের সকলের পত্র সংরক্ষিত রয়েছে।'

তিনি আবার বলতে লাগলেন– 'লোক সকল! আমার আগমন যদি নিতান্তই তোমাদের নিকট তিক্ত মনে হয়। তবে তোমরা আমার রাস্তা হতে সরে দাঁড়াও। আমি এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করব , যেখানে আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে।'

এ সময় কাইস ইবনে আশ'আছ বলে উঠল– 'ইবনে যিয়াদের প্রস্তাব মেনে নিলেই তো পারেন। সে আপনার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস সে দেখাবে না। আপনার মর্যাদাহানী হয় এমন কাজও সে করবে না।'

উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যা করতে যাদের হাত কাঁপেনি। তাদের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা কিভাবে দিচ্ছ তোমরা! যে, তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করবে? মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যার আগে তোমরা কি ভেবেছিলে, তাঁকে এমন নির্মমভাবে হত্যার দুঃসাহস তারা দেখাবে? কিন্তু তোমাদের ভাবনাকে কল্পনার সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁকে শহীদ করতে তারা সামান্য কুণ্ঠিত হয়নি। এখন তোমরাই বল, আমি কি করে তোমাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি? এ যে স্বেচ্ছায় নিজের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর হবে। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি তোমাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না।'

এ কথাগুলো বলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। এ সময় 'যুহাইর ইবনুল ক্বীন' অশ্বে আরোহণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন–

'হে কূফাবাসী! এখনো সময় আছে। তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। তলোয়ার খাপে ভরে নাও। রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র পবিত্র বংশের রক্তে তোমাদের হাতকে রঞ্জিত কর না। ফলাফল তোমাদের জন্য বড় ভয়াবহ হবে। আজ যদি ইবনে যিয়াদের পক্ষ নিয়ে তোমরা এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার অবতারণা ঘটাও, তবে মনে রেখ; ইবনে যিয়াদের কুদৃষ্টি

থেকে তোমরা কেউ রেহাই পাবে না। এ জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমাদের হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না।'

যুহাইরের এ ভাষণ শ্রবণে কূফাবাসী তাঁকে অশালীন ভাষায় গাল-মন্দ করে ইবনে যিয়াদের গুণকীর্তন গেয়ে বলতে লাগল– 'আমরা তোমাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ইবনে যিয়াদের সামনে উপস্থিত করব ।'

যুহাইর বলল– 'হে জালেম সম্প্রদায়! এখনও কি তোমাদের চেতনা জাগরিত হবে না? হযরত ফাতিমা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'র সন্তান হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র তুলনায় 'সুমাইয়্যা'র পুত্র ইবনে যিয়াদের সম্মান কি তোমাদের নিকট বেশী হয়ে গেল? যদি তোমরা নিজেদের হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে অক্ষম মনে কর, তবে তাঁর পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে তোমরা এ পথ থেকে সরে দাঁড়াও। তিনি নিজেই ইয়াযীদের সাথে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। খোদার শপথ! ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া এ কারণে তোমাদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না।'

আলোচনা দীর্ঘায়িত হতে দেখে শিমার সর্ব প্রথম যুহাইরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে তিনি পিছু হটে গেলেন।

অতঃপর হুর ইবনে ইয়াযীদ সামনে এগিয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

'ধ্বংস হোক হে কূফাবাসী তোমাদের! তোমরা কি এজন্যই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে কূফায় আহ্বান করে ছিলে যে, তিনি তাশরীফ আনলে তোমরা তাঁকে হত্যা করবে? তোমাদের আহ্বানের ভাষা তো ছিল– 'আপনার তরে আমাদের জান-প্রাণ সবই উৎসর্গ হোক। আপনি বিলম্ব না করে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসুন। আমরা সর্বোতভাবে আপনার সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' আজ তোমারাই তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ। তাঁর প্রতি সহানুভূতি তো দূরের কথা, তাঁকে পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার সুযোগটুকু দিতেও তোমারা প্রস্তুত নও। চতুর্দিক থেকে তাঁকে তোমরা ঘিরে রেখেছ। এমনকি যে ফোরাতের পানি

বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নি পূজারী, বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ'র নিকৃষ্টতম প্রাণী শুকর পর্যন্ত যে পানির দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। সেই ফোরাতের পানি থেকেও তোমরা তাঁকে বঞ্চিত রেখেছ। যাঁকে উপলক্ষ্য করে এ বিরাট জাহান আল্লাহ পাক সাজিয়েছেন, সেই নবীর বংশধররা এক ফোটা পানির অভাবে তৃষ্ণায় ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে রেখ; কিয়ামতের ময়দানে এক ফোটা পানির জন্য তোমরা কাতরাতে থাকবে, তখন তোমাদের সাহায্যে কেহ এগিয়ে আসবে না। নবীর বংশধরদের এ চরম কষ্ট দেয়ার শাস্তি তখন তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। ভেবে দেখ, এখনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সময় আছে। সময় থাকতে আল্লাহ'র দরবারে তোমাদের কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। পরে হাজারো আফসোস করে কোন লাভ হবে না।'

শিমার নিজেকে আর স্থীর রাখতে না পেরে সৈন্যদের তীর নিক্ষেপের আদেশ দিল। হুর ইবনে ইয়াযীদও বীরবিক্রমে সায়্যিদিনা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে আড়াল দিয়ে শত্রুদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন।

দেখতে দেখতে উভয় পক্ষের ভিতর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শত্রুপক্ষের অনেকেই তীরের আঘাতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র'ও কিছু সাথী শাহাদাতের পেয়ালায় ঠুঁট ছুঁয়ালেন। হুর ইবনে ইয়াযীদ মরণপণ যুদ্ধ করে অসংখ্য শত্রুকে হত্যা করলেন। ধীরে ধীরে সময় গড়ানোর সাথে সাথে যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করল। শত্রুপক্ষ কোনক্রমেই এই অল্প কয়জন লোকের ঈমানী বলের মুকাবিলায় কুলিয়ে উঠতে পারছিল না।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে, পাপিষ্ট শিমার যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে সেনা বাহিনীকে এক সাথে চতুর্দিক দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সংগী সাথীরা বীর-বিক্রমে তাদের মুকাবিলা করে যেতে লাগলেন। রণাঙ্গনের যে দিকেই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছিলেন, শত্রুবাহিনীকে নাস্ত-নাবূদ করে ছাড়ছিলেন। শত্রুবাহিনী পালানোর পথ খোঁজে পাচ্ছিল না। উরওয়াহ্ ইবনে কাইস অবস্থা

বেগতিক দেখে উমর ইবনে সা'আদ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য তলব করে শীশ ইবনে রুবাঈ'-এর উদ্দেশ্যে বলল– 'তুমি নিষ্ক্রীয় কেন শীশ? অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ কর।'

ইবনে রুবাঈ নিজেকে আর স্থীর রাখতে না পেরে কঠোর ভাষায় তার উত্তর দিলেন– 'হে পথভ্রষ্ট মুর্খের দল! চরিত্রহীন 'সুমাইয়্যা' পুত্রের পক্ষ অবলম্বণ করে তোমরা বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে নামীদামী ও সম্মানী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছ। লাজ্জায় মাথা নুয়ে আসে তোমাদের অবস্থা দেখে।'

উরওয়াহ্ ইবনে কাইসের অনুরোধে উমর ইবনে সা'আদ অতিরিক্ত আরও সৈন্য পাঠালেন। রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সংগীগণ অত্যন্ত দক্ষতা আর সাহসিকতার সাথে শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায় 'হুসাইনী বাহিনী' ঘোড়া থেকে বাজ পাখির মত শত্রুর উপর এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হুর ইবনে ইয়াযীদ তখনও বীর বিক্রমে সমান তালে শত্রুদের মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে, শত্রুপক্ষ 'হুসাইনী শিবির'গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। ইতিমধ্যে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনেক সাথী-সংগীই শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শত্রুপক্ষ ধীরে ধীরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এক সাথী তাঁর নিকট এসে আরয করলেন–

'আমার মাতা-পিতা আপনার তরে উৎসর্গিত। আমার খুব সাধ হয়, যুদ্ধ করতে করতে আপনার চোখের সামনে জীবন দিয়ে দেই। আপনার সামনেই শত্রুপক্ষ আমাকে হত্যা করুক। এখন যোহরের নামাযের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে নামায আদায় করে আমি আল্লাহ'র দরবারে উপস্থিত হব।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উচ্চস্বরে উভয় পক্ষের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। তাই নামায আদায় করার

জন্য আপততঃ যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণা করা হোক।'

কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কে শুনে কার কথা; বরং যুদ্ধের তীব্রতা উত্তরোত্তর শুধু রেড়েই চলল। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ঐ সাথীটি শাহাদাত বরণ করলেন।

যুদ্ধ বিরতির কোন লক্ষণ না দেখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সাথীদের নিয়ে 'সালাতুল খাউফ'-এর নিয়মানুযায়ী নামায আদায় করে নিলেন। নামাযের পর যুদ্ধের তীব্রতা পূর্বের তুলনায় শত গুণে বৃদ্ধি পেল। একে একে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সকল সংগীই শাহাদাতের শরাব পান করলেন। মাত্র কয়েকজন সাথী নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় যুহাইর ইবনুল কীন নিজেকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি প্রসংশনীয় বীরত্বের সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন।

এমন অবস্থায় সাথীরা এ কথা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছিলেন যে, আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও আর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে রক্ষা করতে পারব না। এমন কি নিজের প্রাণ বাঁচানোর কোন পথও এখন আর খোলা নেই। তদুপরি অলৌকিক ঈমানী বলে খোদার রাহে জীবন উৎসর্গ করার সুতীব্র বাসনা এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা যেন নতুন সাহসে, নতুন মনোবলে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভের হাতছানিতে বিপুল বিক্রমে শত্রু নিধন করতে লাগলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়াবহতা যেন তাঁদের আরো ক্ষেপিয়ে তুলল। প্রত্যেকের মাঝে শত্রু বাহিনীকে পর্যদুস্ত করার মনসিকতায় প্রতিযোগিতা শুরু হল। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাঁরা অব্যাহত গতিতে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাহেবজাদা আলী একটি কবিতা আবৃতি করতে করতে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। যার ভাবার্থ হলো-

'আমি আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী। কাবার প্রভুর শপথ! আমি

নবীর নিকটবর্তী হওয়ার বেশী অধিকারী।'

তিনি কবিতার এই পংক্তি দু'টি ইয়াযীদ বাহিনীর সামনে উচ্চস্বরে আবৃতি করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যে দিকেই যাচ্ছিলেন, সে দিকেই শত্রু বাহিনীর মাঝে ত্রাস সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল। শত্রু বাহিনীর কাউকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করছিলেন। আবার কাউকে জাহান্নামের ঠিকানা বাতলে দিচ্ছিলেন। তাঁর বিরামহীন আক্রমণের সামনে কেউ স্থীর থাকতে পারছিল না। পরিস্থিতি ভয়াবহ দেখে কেউ আর এগিয়ে আসার সাহস পাচ্ছিল না। যাকে আক্রমণ করছিলেন তাকেই তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যুদ্ধের স্বাদ কাকে বলে। অবস্থা বেগতিক দেখে হতভাগা 'মুর্‌রা ইবনে মুন্‌কিজ' বর্ষা দ্বারা তাঁর উপর মারাত্মকভাবে আঘাত করে বসল। সুযোগ বুঝে পাপিষ্টরা সব একসাথে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্ভাগারা তাঁকে শহীদ করে লাশকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

এই ক্ষত-বিক্ষত লাশ দেখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'এমন নির্দোষ বালককে যারা হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না, আল্লাহ পাক সেই গোত্রকে নির্মূল করে দিন।' এ কথা বলে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' লাশটি কোলে করে নিয়ে শিবিরের পাশে শুইয়ে দিলেন।

অন্যদিকে আমর ইবনে সা'আদ ইবনে নুফাইল আয্‌দী' হযরত হাসানের পুত্র কাশেমের মাথায় তরবারী দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করায় তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'চাচাজান! আমায় বাঁচান!' এই আওয়াজ শুনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছুটে গিয়ে তরবারী দ্বারা আ'মর ইবনে সাআদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে দেহ থেকে তার ডান হাতের কনুই পর্যন্ত আলাদা করে ফেললেন। তারপর তিনি ভাতিজা কাশেমের লাশকেও কাঁধে নিয়ে পুত্র আলী আকবরের পাশে শুইয়ে দিলেন। (১)

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৮৬-২৮৬
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৭৮-১৮৫
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ৩২০-২৪১

হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাত

শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা ও রেযায়ে মাওলার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথী-সঙ্গীরা পরলোকের ডাকে সাড়া দিয়ে একে একে নিজেকে মৃত্যুর কোলে সঁপে দিলেন। জীবন বাজি রেখে বীরদর্পে যুদ্ধ করতে করতে সবাই তখন তাঁকে একা ফেলে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। তখনও শত্রু বাহিনীর কারো সাহসে কুলাচ্ছিল না অস্ত্র হাতে তাঁর দিকে এগুবার। একদিকে সাথী-সঙ্গী হারা মা'মূলী অস্ত্র হাতে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত, পিপাসায় কাতর একা এক বিদেশী মুসাফির। অন্যদিকে বিভিন্ন অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত স্থানীয় বেনিয়াদের এক বিরাট বাহিনী। এক দিকে 'মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী'র চেতনায় উদ্বেলিত এক আহত চিতা, অন্যদিকে ক্ষমতালিপ্সু খুন পিয়াসীদের পদলেহী একদল ধূর্ত শৃগাল।

একে তো হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অস্ত্রের সামনে হাজির হওয়ার সাহস কারো হচ্ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এতো বড় পাপের বোঝা কেউ নিজের মাথায় নিতে রাজি ছিল না। এই জটিল পরিস্থিতিতে 'কিন্দা' গোত্রের 'মালিক ইবনে নুসাইর' নামক এক পাষণ্ড হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল। তিনি এ আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়লেন। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছিলেন। এ সময় তাঁর কোলে ছিল নিজের শিশু বাচ্চা আব্দুল্লাহ। তাকে তিনি আদরে-সোহাগে মাতিয়ে রাখছিলেন। বনী আস'আদের এক নির্দয় পাষণ্ড বাচ্চাটিকে উদ্দেশ্য করে তীর ছুড়লে, তীরের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটিও মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এই নিষ্পাপ শিশুটিকে মাটির উপর শুইয়ে দিয়ে খোদার দরবারে প্রার্থণা করলেন– 'প্রভু হে! তুমি নিজেই এই অত্যাচারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।'

পানির প্রচণ্ড তৃষ্ণা আর সহ্য করতে না পেরে তিনি ফোরাতের দিকে

অগ্রসর হলেন। এই সুযোগে 'হাসীন ইবনে নুমাইর' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে তা গিয়ে তাঁর কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়। ফলে রক্তের ধারা বয়ে যায় কণ্ঠনালী থেকে। এ সময় শিমার অস্ত্রে সুসজ্জিত দশ জনের এক চৌকস বাহিনী নিয়ে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তৃষ্ণার্ত হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই করুণ অবস্থাতেও কোন্ অলৌকিক শক্তি যেন তাঁর উপর ভর করল। তিনি একা এই দশজনের বিরুদ্ধে বীরদর্পে অব্যাহত গতিতে লড়ে যেতে লাগলেন। তাঁর বিরামহীন তীব্র আক্রমণের সামনে কেউ আর স্থীর থাকতে পারছিল না। তিনি যে দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, শত্রুরা সেদিক থেকেই পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল।

ইতিহাসবিদদের মতে এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। যার চোখের সামনে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন খোদার রাহে একে একে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। নিজেও যিনি শত্রুদের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত। এমন একজন লোক কি করে এমন নির্বিকারভাবে দৃঢ়তা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারলেন! এ তো কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, এমন এক ব্যক্তির আক্রমণের তীব্রতার সামনে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাণ রক্ষা করাই যেন তাদের জন্য দুরূহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

শিমারের এ অবস্থা আর সহ্য হল না। সে চিৎকার করে সকলকে একযোগে আক্রমণ করার আহ্বান জানাল। তার এই ডাকে সাড়া দিয়ে কয়েকজন দুর্ভাগা একযোগে তাঁর উপর আক্রমণ চালাল। তাদের ঐক্যবদ্ধ হামলার তীব্রতা সইতে না পেরে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-এর কলিজার টুকরা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাতের শরাব পান করলেন। সেই সাথে হিজরত করে গেলেন এ নশ্বর পৃথিবী থেকে অন্তলোকের চিরশান্তির নীড়ে। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

শুহাদায়ে কারবালার সাথে অমানবিক আচরণ

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের পর শিমারের নির্দেশ মুতাবেক 'খাওলা ইবনে ইয়াযীদ' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পবিত্র দেহ থেকে শিরোচ্ছেদ করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণই এক ভয়াবহ ভীতি তার হৃদকম্পন শুরু হল এবং ভয়ে সে পিছু হটে গেল। শেষ পর্যন্ত পাপিষ্ট 'সিনান ইবনে আনাস' এ জঘন্য কাজটিকে বড় নির্মমভাবে সমাধা করল। অনুসন্ধানের পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দেহ মুবারকে মোট ৩৩টি বর্শার আঘাত এবং ৩৪টি তরবারীর আঘাত ছাড়াও অসংখ্য তীরের জখমের চিহ্ন পাওয়া গেল।

পাপিষ্টরা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ আহলে বাইতের সকলকে হত্যা করার পর অসুস্থ জয়নুল আবেদীনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে 'হুমাইদ ইবনে মুসলিম' এ অপকর্ম থেকে শিমারকে বাধা দিয়ে বললেন– 'সুবহানাল্লাহ! অসুস্থ শিশুকে হত্যা করতেও তোমার বিবেকে বাধে না?' তার কথা শুনে শিমার পিছিয়ে গেল।

এ দিকে উমর ইবনে সা'আদ নির্দেশ জারি করলেন– 'মেয়েদের তাবুর কাছে কেউ আসবে না এবং অসুস্থ শিশুদের উপর কেউ হাত তুলতে পারবে না।'

কমবখ্ত ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মুতাবেক উমর ইবনে সা'আদ কয়েকজন সঙ্গীকে আদেশ দিলেন, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পবিত্র দেহকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিশে ফেলতে। এই জঘন্যতম কাজটি করতেও অভাগাদের হৃদয়ে সামান্যতম দয়ার উদ্রেক হল না। এই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে তাদের অন্তরটা এতটুকু কাঁপল না।

যুদ্ধের পর নিহতদের গণনা করে দেখা গেল যে, আহলে বাইত ও

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষের বাহাত্তর ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন এবং শত্রু পক্ষের মৃতের সংখ্যা ছিল ৮৮। 'গাজেরিয়া'র বাসিন্দারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ আহলে বাইতের ৭২ জনের দাফন-কাফনের কাজ পর দিনই শেষ করেন।

খাওলা ইবনে ইয়াযীদ ও হুমাইদ ইবনে মুসলিম যখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ শহীদানে কারবালার শিরগুলো ইবনে যিয়াদের দরবারে উপস্থিত করল। ইবনে যিয়াদ তখন কূফার সর্বস্তরের লোককে একত্রিত করে শিরগুলোকে তাদের সামনে রাখল। এ সময় সে হাতে একটি চাকু নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ঠুঁটে খোঁচা দিচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে বয়োঃবৃদ্ধ সাহাবা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সহ্য করতে না পেরে কান্না বিজড়িত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন–

'ইবনে যিয়াদ! এই পবিত্র শির থেকে তোমার চাকু সরিয়ে নাও। আমি অসংখ্যবার এই উষ্ঠদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে চুমু খেতে দেখেছি।' এ কথায় ইবনে যিয়াদের রাগ আরো বেড়ে গেল। সে বলে উঠল– 'আজ যদি তুমি বৃদ্ধ না হতে, তবে আমি এখনই তোমার শিরোচ্ছেদের হুকুম দিতাম।'

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম এ কথা বলতে বলতে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন– 'হে জাতি! তোমরা আজ ফাতিমার সন্তানের রক্তে নিজেদের হাত রাঙ্গাতে কুণ্ঠিত হলে না! তাঁকে হত্যা করে তোমরা 'মারজানা'র সন্তান (ইবনে যিয়াদ) কে তোমাদের শাসক হিসেবে গ্রহণ করলে! যে লোক শত শত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। আর দুষ্ট ও অপরাধপ্রবণ লোকদের প্রশ্রয় দেয়। যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুশ্চরিত্র লোকদের ফাসাদ সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। ধিক! তোমাদের এই জঘন্য মনোবৃত্তির। আল্লাহ'র অভিশাপ নেমে আসুক তোমাদের মত স্বাপদদের উপর।'

দু'দিন পর উমর ইবনে সা'আদ অবশিষ্ট আহলে বাইতের সদস্যদের সাথে নিয়ে কূফা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। সবাইকে নিয়ে যখন ইবনে যিয়াদের দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন হযরত হুসাইনের বোন যয়নাব নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ পোষাকে, বড় করুণ অবস্থায় ছিলেন। কয়েকজন পরিচারিকা

পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এক জায়গায় নিরবে বসে ছিলেন। তাঁকে চিনতে না পেরে ইবনে যিয়াদ প্রশ্ন করল– 'ইনি কে?' তিনি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। এমনিভাবে কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পর এক পরিচারিকা উত্তর দিল– 'ইনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বোন যয়নাব বিনতে ফাতিমা।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ বলে উঠল– 'আল্লাহ'র শোকর যে, তিনি তোমাদের অপমানিত ও ধ্বংস করেছেন।'

হযরত যয়নাব বললেন– 'শত সহস্র প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদেরকে মুহাম্মদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র বংশের মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাদের পবিত্রতার কথা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। আর লাঞ্চিত শুধুমাত্র তারাই হয়ে থাকে, যারা আল্লাহ'র আদেশ অমান্য করে বিপথগামী হয়।'

ইবনে যিয়াদ অতি রাগান্বিত হয়ে বলল– 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের বিদ্রোহ থেকে মুক্ত করেছেন এবং তোমাদের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন।'

হযরত যয়নাব তখন আর আত্ম-সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন– 'তুমি আমাদের ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করেছ। আর এর দ্বারাই যদি তোমার আত্মপ্রশান্তি হয় তো হোক।'

অতঃপর ইবনে যিয়াদের কুদৃষ্টি নিপতিত হল হযরত আলী আসগরের (জয়নুল আবেদীন) প্রতি। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করল– 'তোমার নাম কি?'

তিনি বললেন– 'আমার নাম আলী।'

ইবনে যিয়াদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল– 'তাকে না হত্যা করা হয়েছে?'

উত্তরে তিনি বললেন– 'আমার বড় ভাইয়ের নামও ছিল আলী। হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। আমাকে নয়।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ তাঁকেও হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে আলী আসগর (জয়নুল আবেদীন) বললেন– 'আমাকে হত্যা কর, তাতে আমার কোন আফসোস নেই। বরং এই অবস্থায় জীবিত থাকাটাই আমার জন্য বেশী

কষ্টদায়ক। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ! আমাকে হত্যা করা হলে এই অসহায় অবলা নারীদের কি অবস্থা হবে? ভাব নি, আর তা ভাববার সময় বা মানসিকাতও তোমার নেই।'

দু'জনের আলাপচারিতার মাঝেই হযরত যয়নাব চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'হে ইবনে যিয়াদ! আমাদের রক্তের পিয়াস কি তোমার এখনো মিটেনি? এই বালকটিও কি তোমার রাক্ষুসী হাত থেকে রেহাই পাবে না? খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, এই বালককে হত্যা করতে হলে আগে আমাকে হত্যা করতে হবে।'

হযরত আলী আসগর আবার বললেন– 'হে ইবনে যিয়াদ! এই লোকদের প্রতি যদি তোমার অন্তরে সামান্যতম মর্যাদাবোধ থেকে থাকে। তবে আমার মৃত্যুর পর তাদের সঙ্গে কোন খোদাভীরু লোককে প্রেরণ কর। যিনি ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী তাদের সহযোগিতা করবেন।'

ইবনে যিয়াদ এ কথা শুনে বলল– 'আচ্ছা? তাহলে এই বালকটিকেই মুক্ত করে দাও। সে নিজেই এ দায়িত্ব পালন করবে।'

এরই মাঝে ইবনে যিয়াদ কূফার সকল মানুষকে মসজিদে সমবেত করে এক ভাষণ দেয়। ভাষণে সে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং হযরত আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নাম নিয়ে অত্যন্ত অশালীন ও অপমানজনক ভাষায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে। মসজিদে 'আব্দুল্লাহ ইবনে আফিফ আযদি'ও উপস্থিত ছিলেন– ইবনে যিয়াদের মুখে হযরত আলী ও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' সম্পর্কে এ ধরনের জঘন্য উক্তি শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন–

'হে মিথ্যাবাদীর সন্তান মিথ্যাবাদী! তুমি নবী বংশের মর্যাদায় আঘাত হেনেছ। তাঁর নিষ্পাপ সন্তানদের হত্যা করেছ। এখন আবার তুমি তাঁদের চরিত্রে কলংক লেপনের দুঃসাহস দেখাচ্ছ।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করল। ইবনে যিয়াদের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাঁর গোত্রের সকল লোক ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি নিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

রাখার জন্য সে তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিল।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও আহলে বাইতের সাথে এমন চরম অবমাননাকর আচরণ করার পরও ইবনে যিয়াদের স্বাদ মিটল না। উপরন্তু তার নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মাত্রা যেন শুধু বেড়েই চলল। অপমানের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শির একটি কাষ্ঠখণ্ডে উঁচিয়ে কূফার অলিতে-গলিতে ঘুরিয়ে জনসাধারণকে এ দৃশ্য দেখানোর নির্দেশ দিল। তার পা'চাটা কুকুরগুলো এ জঘন্যতম কাজটি করতে সামান্যতম দ্বিধাও করল না।

পরিশেষে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শির ইয়াযীদের নিকট পাঠানো হল। একই সংগে আহলে বাইতের অবশিষ্ট মহিলা ও শিশু-বাচ্চাদেরও প্রেরণ করা হল। এই পাপের বোঝা বয়ে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় তারা ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিত হলে ইয়াযীদ জিজ্ঞেস করল– 'কি সংবাদ নিয়ে এসেছ তোমরা?'

তারা কারবালার ময়দানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলল– 'আমীরুল মু'মিনীন! শুনে নিশ্চয় খুশি হবেন যে, আমরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করেছি এবং সকলকে হত্যা করে তাদের শির ও অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও শিশু-বাচ্চাদের আপনার নিকট উপস্থিত করেছি।'

এ সংবাদ শুনে ইয়াযীদ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলতে লাগল– 'আমি তোমাদের থেকে এতটুকু আনুগত্যের প্রত্যাশী ছিলাম যে, তোমরা তাঁকে হত্যা না করে বন্দী অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত করবে। 'ইবনে সুমাইয়্যা' (ইবনে যিয়াদ)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত ও অভিশাপ। সে কেন এদের হত্যার নির্দেশ দিল। খোদার শপথ! আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে অবশ্যই তাঁদের ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় দিন!' এরপর ইয়াযীদ তাদের কোন পুরস্কার না দিয়ে বিদায় করল। (১)

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড -৩, পৃষ্ঠা -২৯৩-২৯৮
তারীখে তাবরী, খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা - ৩৪২-৩৫২
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড -৮, পৃষ্ঠা -১৮৬-১৯১

ইয়াযীদের নির্দেশে আহলে বাইতের সদস্যদের শাহী মেহমান খানায় প্রেরণ করা হল। একে একে ইয়াযীদ পরিবারের সকলেই তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করল। আহলে বাইতের যে সব গয়নাগাটি যুদ্ধের ময়দানে খোয়া গিয়েছিল, তার পরিবর্তে ইয়াযীদ অনেক বেশী পরিমাণে দিয়ে এ দিকটি পুশিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। এবং আহলে বাইতের সকলের থাকার জন্য শাহী মেহমান খানায় বিশেষ ব্যবস্থা করল।(১)

আহলে বাইতের মদীনা যাত্রা
ইয়াযীদের রহস্যময় আচরণ

শাহী মেহমানখানায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর ইয়াযীদের পক্ষ হতে আহলে বাইতের সকল সদস্যকে সসম্মানে মদীনায় পৌছে দেয়ার সুব্যবস্থা করা হল। পথে যেন তাঁদের কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সে জন্য নু'মান ইবনে বশীরের উপর তদারকীর দায়িত্ব অর্পন করা হল। নির্দেশ মুতাবেক নু'মান ইবনে বশীর খোদাভীরু, আমানতদার, সৎসাহসী লোকদের নিয়ে একটি দল প্রস্তুত করে ফেললেন।

মদীনার পথে যাত্রার প্রাক্কালে আলী আসগরকে ডেকে ইয়াযীদ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে বলল– 'খোদার অভিশাপ ইবনে মারযানা (ইবনে যিয়াদ)-এর উপর! ঘটনাস্থলে যদি আমি উপস্থিত থাকতাম। তবে আল্লাহ'র শপথ! আমি তোমার বাবার দেয়া যে কোন শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিতাম এবং যে কোন উপায়ে আমি এ যুদ্ধ এড়িয়ে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতাম। রক্ষা করতাম তাঁদের মৃত্যুর হাত থেকে। এই পন্থা

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড -৩, পৃষ্ঠা -২৯৯-৩০০
তারীখে তাবরী, খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা - ৩৫২- ৩৫৬

অবলম্বন করতে গিয়ে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু খোদার মর্জী ছিল অন্য রকম। তাই এখন আর আফসোস করেও লাভ হবে না। তিনি যা চেয়েছেন তাই ঘটে গেল। এর অন্যথা করার সাধ্য কারো ছিল না। অতএব যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আর মন খারাপ করে লাভ নেই। ঘটনার জন্য যদি আমার প্রতি তোমাদের বিরূপ ধারণা জন্মে থাকে, তবে আমার মনে হয় তা আমার উপর সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচার করা হবে। কারণ যা ঘটেছে তা আমি তো ঘটাইনি? এমনকি এমন পরিস্থিতির জন্য আমি একেবারে অপ্রস্তুত ছিলাম। যা হোক পরিষ্কার ও খোলা মন নিয়ে মদীনায় ফিরে যাও। কখনো কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে আমাকে জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। তোমাদের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব । ঠিক আছে যাও, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।'

এখানে ইয়াযীদের আচরণ ছিল রহস্যময়। যে ব্যক্তির কারণে এমন মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনার সূত্রপাত হল, যার বর্বর বাহিনীর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কারণে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সপরিবার ও সদলবলে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করলেন, ঘটনার পর সেই ইয়াযীদই আবার ইমাম পরিবারের নিকট সমবেদনা প্রকাশ করছে, ঘটনার জন্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছে, আহলে বাইতের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করছে না। এটা সত্যিই আশ্চর্য্যের ব্যাপার বটে। আসলে এ ঘটনার জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে এমন আচরণ করা বিচিত্র কিছু নয়। হতে পারে ইয়াযীদের হৃদয়পটে ভীষণ আলোড়ন তুলেছিল বলেই সে বাহ্যত এমন প্রশস্ত মনের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এবং ইয়াযীদের পরবর্তী কার্যকলাপ ও পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথাই স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে যে, এসবই ছিল তার লোক দেখান নাটক। জনগণের মনের ক্ষোভকে প্রশমিত ও স্তিমিত করে ক্ষমতার ভীতকে আরো মজবুত করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে যে কোন অভিনয় করতে বা পদক্ষেপ নিতে সে ছিল বদ্ধপরিকর। তাইত দেখা যায়, জীবন সন্ধ্যায় এসেও মদীনা আক্রমণের দুঃসাহস দেখিয়েছিল সে। যে বৎসর মদীনা আক্রমণ করেছিল সে বৎসরই সে মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ে। আল্লাহ তার প্রাপ্য স্থান

তাকে নসীব করুন।

ঘটনা যাই হোক, ইয়াযীদের বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোকেরা আহলে বাইতকে সাথে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করল। পথে তারা সত্যিই তাদের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর প্রমাণ দিয়েছিল। তাদের কারণে সারা রাস্তায় সামান্য কষ্টও আহলে বাইতকে ভোগ করতে হয়নি। আহলে বাইতের আরাম-আয়েশ ও নিরাপত্তার দিকে ছিল তাদের প্রখর দৃষ্টি। দিনের বেলায় তাদের যে কোন প্রয়োজন দ্বিধাহীন চিত্তে মিটাতে তারা ছিল সদা প্রস্তুত। আর রাতের বেলায় আহলে বাইত ও তাঁদের সাওয়ারীর পাহারায় তারা থাকত অতন্দ্র প্রহরায় নিয়োজিত।

মদীনায় পৌঁছে তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে হযরত ফাতিমা বিনতে আলী ও হযরত যয়নাব বিনতে আলী নিজেদের অলংকারাদী খুলে তাদের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন– 'সত্যিই তোমাদের ব্যবহারের কোন তুলনা হয় না। তোমাদের খুশী করার মত সামর্থ আমাদের নেই। তবুও আমাদের সাধ্য অনুযায়ী এ গুলো তোমাদের উপহার দিচ্ছি। তোমরা খুশী মনে তা গ্রহণ করে নাও।'

অলংকারগুলো ফিরিয়ে দিয়ে প্রত্যোত্তরে তারা বলল– 'পার্থিব কোন পুরস্কারের মোহে আমরা এ কাজ করিনি– রাসূলুল্লাহর পবিত্র বংশের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। আমরা শুধু সে দায়িত্বটুকু পালন করেছি।'

মদীনায় আসার পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র স্ত্রী স্বামী শোকে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক বৎসর পর স্বামীর সঙ্গ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতে পাড়ি জমান। (১)

---

(১) আল-কামেল লি-ইবনে আছীর খণ্ড -৩ পৃষ্ঠা -৩০০

হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের পরিণতি

ফোরাতে পানি পান করতে গিয়ে তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আল্লাহ'র দরবারে এই বলে মুনাজাত করেছিলেন- 'হে প্রতিপালক! তোমার রাসূলের আদরের দৌহিত্রের সাথে আজ যারা এই অমানবিক আচরণ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমি শুধু তোমার দরবারেই নালিশ পেশ করছি। এদের একজন একজন করে তুমি ধ্বংস করে দিও। কাউকে তুমি রেহাই দিও না।'

মাযলুমের আহাজারি কবূল হতে বিলম্ব হয় না। তদুপরী রাসূলের দৌহিত্রের পবিত্র কণ্ঠ দিয়ে যে দোয়া বেরিয়েছে, তা কবূল না হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে দুনিয়ার বুকেই তারা ভোগ করেছে কঠিন শাস্তি। আখেরাতের নির্ধারিত শাস্তির পূর্বেই তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাবের। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত কেউ রেহাই পায়নি। কাউকে হত্যা করা হয়েছে বড় নির্মমভাবে। কারো চেহারা হয়ে গেছে বিশ্রী কালো। লাবণ্যের জায়গা দখল করেছে কদার্যতা। কেউ বা আগুনে পুড়ে তীলে তীলে জ্বলে মরেছে। আবার পানির তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে কারো প্রাণ পাখি উড়াল দিয়েছে। কারো আবার দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বেঁচে থেকেও দুনিয়ার সৌন্দর্য্য অবলোকন তাদের ভাগ্যে জুটেনি। মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে সকলেই।

মোটকথা- হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হত্যাকাণ্ডে জড়িত একজন সদস্যও এই দুনিয়াতেই আল্লাহ'র কঠিন পাকড়াও থেকে নিস্তার পায়নি। এ ঘটনার পর ইয়াযীদ একদিনের জন্যও শান্তিতে তার রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেনি। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র শহীদদের খুনের প্রতিশোধের আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলে উঠল এবং বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ আরম্ভ হল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের পর এ কঠিন

বিদ্রোহের ভিতর সে মাত্র দুই বৎসর আট মাস, মতান্তরে তিন বৎসর আট মাস শাসনকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিল এবং নিতান্তই লাঞ্চিত অবস্থায় তাকে এই দিনগুলো অতিবাহিত করতে হয়েছিল। আর এই লাঞ্চিত অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেছিলেন। (১)
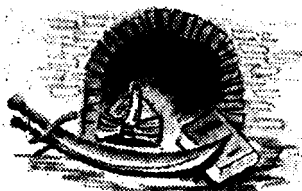
আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের মনোভাব

কারবালার যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের দুই সন্তান শাহাদাতের শরবত পান করেছিলেন। ছেলেদের শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় ইবনে জা'ফরের নিকট পৌঁছল, তখন আত্মীয়-স্বজন আর পরিচিতজনরা সমবেদনা জানাতে তাঁর কাছে ছুটে আসতে থাকল। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে তাঁকে শান্তনা দিতে লাগল। সমবেত লোকদের মাঝে একজন হঠাৎ বলে উঠল– 'হুসাইনের কারণে আজ আমাদের এ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সে জিদ না করলে এত দুঃখ-কষ্ট হয়ত আমাদের কপালে হত না।'

এ কথা শুনা মাত্রই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তার দিকে জুতা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– 'দুর্ভাগা! তোর স্পর্ধা তো কম নয়। কার বিরুদ্ধে কথা বলছিস জানিস? খোদার শপথ! আমি নিজেও যদি সে দলে শরীক হয়ে শহীদ হতে পারতাম, তবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতাম। সেই সৌভাগ্য আমার নসীবে না থাকলেও আমার বড় শান্তনা যে, আমার ছেলেরা সে কাজটুকু করতে পেরেছে।' (২)

১। তারীখে তাবরী, খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা -৩৫৭

(২) শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ১০০-১০৩

ইবনে আব্বাসের স্বপ্ন

এ ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন– 'আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে স্বপে দেখতে পাই। ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়। অত্যাধিক চিন্তান্বিত ও বিষণ্ন মনে হল তাঁকে। কাদাযুক্ত অবস্থায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটে আসছেন। তাঁর হাতে রক্তে পরিপূর্ণ একটি বোতল দেখা যাচ্ছিল। ইবনে আব্বাস বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে প্রশ্ন করলাম– 'হে আল্লাহ'র রাসূল! এই সময়ে এই করুণ অবস্থায় আপনি কোত্থেকে আসছেন?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বললেন– 'হে ইবনে আব্বাস! আমি কি করে মদীনায় শুয়ে থাকতে পারি? আজ আমার কলিজার টুকরা হুসাইনকে কারবালার ময়দানে যালিম ইয়াযীদ বাহিনী টুকরো টুকরো করে ঘোড়ার পায়ের নীচে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। আমি আমার কলিজার টুকরার শাহাদাতের মর্মান্তিক ও করুণ দৃশ্য দর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম।'

ইবনে আব্বাস বলেন, আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম– 'হে আল্লাহ'র রাসূল। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' আপনার হাতে কি?'

তিনি বললেন– 'ইহা একটি বোতল! কারবালার ময়দান থেকে কিছু রক্ত জমিয়ে এ বোতলে করে নিয়ে এসেছি। কিয়ামতের ময়দানে এ রক্ত পেশ করে আমি এ ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ'র দরবারে ফরিয়াদ জানাব।'

এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সকলকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এর কিছু দিন পর বাস্তবেই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের সংবাদ মদীনায় পৌঁছল। পরে হিসাব করে দেখা গেল, তিনি যেদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন, ঠিক সে দিনই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' শাহাদাত বরণ করে ছিলেন। (১)

---

(১) শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ৯৭
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর। ৩য় খণ্ড,
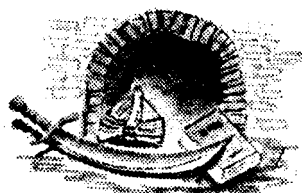
কারবালার শিক্ষা

কারবালার হৃদয় স্পর্শী ঘটনা মূলতঃ একই সাথে বেদনা ও জাগরণের এক যৌথ অধ্যায়। বেদনা, নিষ্ফল বলেই প্রয়োজন জাগরণের। অশ্রুর ভাষায় পঠিত এই ইতিহাসকে চেতনা সমুজ্জল দরসে পরিণত করা উচিত। বাতিলের সাথে আপোস না করে আল্লাহ'র যমীনে আল্লাহ'র খেলাফত প্রতিষ্ঠার এই ঝুঁকিবহুল, বিস্বাদময় ইতিহাস মূলতঃ বিপ্লবের এক প্রতিবাদী চেতনা জন্মেরই দাবী রাখে।

কারবালার ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ। এ হৃদয় বিদারক ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ যদি এ কথা বলার অপপ্রয়াস চালায় যে, অন্ততঃ আংশিক হলেও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র একরুখা মনোভাবকে দায়ী করা যেতে পারে। কেননা তিনি এমন নাছুর বান্দা না হয়ে সযত্নে এড়িয়ে যেতে পারতেন সবকিছু। তবে তা হবে চিন্তার ক্ষেত্রে তার নিষ্ক্রিয়তারই পরিচায়ক। বরং বলা যেতে পারে চিন্তার ক্ষেত্রে এক তরফা মনোবৃত্তি। আর অসুস্থ মস্তিষ্ক থেকেই এমন ভাবনার উদ্ভব ঘটা সম্ভব। কারণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বিভিন্ন ভাষণে এবং সুস্থ মানসিকতা নিয়ে ইতিহাসের সঠিক ও নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, এ ক্ষেত্রে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সিদ্ধান্তই ছিল সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল।

নানাজী হযরত রাসূলে খোদা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র রেখে যাওয়া দ্বীনকে অবিকৃত অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে, খেলাফতের মাসনাদকে কন্টকমুক্ত রাখার আশা বুকে নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আত্মত্যাগের যে নযীর স্থাপন করলেন, তা পরবর্তী উম্মতে মুহাম্মদীকে সত্যের পথে অবিচল থাকার প্রেরণা যুগাবে। কারবালা

যুগে যুগে পৃথিবীতে আল্লাহ'র রাজত্ব কায়েমের জিহাদে এ পথের সৈনিকদের দৃঢ় মনোবল নিয়ে, অকুতভয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও মদদ যুগাবে।

তাই তো দেখা যায়, এ ঘটনার সামান্য কয়েক বছর পরই বাতিল শক্তির অপশাসনের অবসান ঘটে কায়েম হয়েছিল ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ খেলাফত। এই সোনালী যুগে 'বাঘে-ছাগে' এক ঘাটে পানি পান করার জনশ্রুতিও বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তীতেও সুদীর্ঘ সময় যাবৎ ইসলামী শাসনের সুফল মানুষ ভোগ করেছে। মুসলিম শাসকগণ খেলাফতের মাসনাদে বসে নবীজীর রেখে যাওয়া আদর্শকেই বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। অনেকেই পূর্ণ সফলতার নাগাল পেয়েছেন। আবার অনেকেই এ খেলাফতকে পুরো না পারলেও আংশিক প্রতিষ্ঠায় নিজেকে ব্রতি রেখেছেন আজীবন।

এর পরবর্তী যুগেও এ সূত্রিতায় বিয়োগ ঘটেনি। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যে কোন সময় তাগুতিশক্তি মাথাচাড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে, তখনই প্রতিরোধের অলংঘনীয় প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে সে যুগের, সে অঞ্চলের, হুসাইনী সৈনিক। এ সূত্রিতায় কখনো ভাটা পড়েনি, পড়বেও না কোনদিন।

এই উপমহাদেশেও এ কায়দার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাতিলের অনিবার্য প্রতিরোধে এখানেও জন্ম নিয়েছে সত্যপথের অজস্র পথিক, অসংখ্য অকুতভয় নকীব। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় এখানেও পাঠিয়েছেন খেলাফত প্রতিষ্ঠার 'হুসাইনী সৈনিক'দের।

ভারতবর্ষ যখন বৃটিশ বেনিয়াদের সীমাহীন নির্যাতনে অতিষ্ট। সমাজ সংস্কৃতি আর তাহযীব তমদ্দুনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন লালিত হচ্ছিল 'সাদা চামড়া'র মন-মানসিকতা। লাঞ্চনাকর গোলামীর জিঞ্জিরে তারা যখন পেচিয়ে ধরেছিল এখানকার সরল সহজ মানুষগুলোকে। গৃহযুদ্ধের আবহাওয়াকে চাঙ্গা করে দিয়ে তারা যখন দু'মুঠ ভরে ফায়দা লুটতে ব্যস্ত। তখন আল্লাহ পাক এখানেও তাঁর রহমতের দৃষ্টি দিলেন। প্রেরণ করলেন হুসাইনী আদর্শের সোচ্চার সৈনিক, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্নি পুরুষ শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) কে। যিনি 'তাহরীকে খেলাফত'-এর নামে

তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে বৃটিশ শ্বেত-ভল্লুকদের করেছেন বিতাড়িত; অন্যের পাতে হাত দেয়ার সাধ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের হাড়ে হাড়ে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের অবিস্মরণীয় বিপ্লবী নেতা, মাল্টার জেলে বন্দী জীবন পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তণ করলে, তাঁকে এক নজর দেখার বাসনা নিয়ে, তাঁর পবিত্র হাতের সামান্য পরশ লাভের দুর্বার আকাংখা বুকে বেঁধে ভীর জমিয়েছিল অসংখ্য, অগণিত মুক্তিকামী মানুষ। কিছুদিন পূর্বেও যিনি আমাদের অন্ধকার জগতে আলোর মশাল জ্বালিয়ে আমাদের অন্তরে আশা জাগিয়েছিলেন, ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শান্তি ও সমৃদ্ধির, সেই অলিকুল শিরমণি আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-ও সেদিন সেই ভাগ্যবান অসংখ্য লোকের ভীরেই হাজির ছিলেন। সেই মহামনিষীকে দেখে তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে ধন্য হয়ে ছিলেন।

তাঁর সতেজ হাতেই খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী চেতনা বুকে নিয়ে তিনি বাংলার যমীনে পদার্পণ করেছিলেন। সেই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে, বুকভরা আশা নিয়ে তিনি বাংলার যমীনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন খোদার রাজত্ব। কায়েম করতে চেয়েছিলেন আল্লাহ'র যমীনে আল্লাহ'র খেলাফত। এ লক্ষ্য অর্জনের একাগ্র সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তাঁর বার্ধ্যক্য জনিত ন্যুব্জতা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে চালিয়ে গেছেন বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তাঁর অব্যাহত সফর। ক্লান্তি যেমন তাঁকে কাবু করতে পারেনি, তেমনি পার্থিব কোন লোভ-লালসাও তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান থেকে সামান্য টলাতে পারেনি। দিনরাত ছুটাছুটি করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তিনি বুঝানোর চেষ্টা করেছেন ইসলামী হুকুমতের সুফল। রাজনীতির খোলা চত্বরে তিনি সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রকাশ্য 'তাওবা'র।

তাঁর মিশনকে তিনি শুধু বাংলার যমীনেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। দেশ থেকে দেশান্তরে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্বে, সুদূর লণ্ডন, ইরান, ইরাকসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এ বিপ্লবের মন্ত্র তিনি বিস্তৃত করেছেন, এ আহ্বানের মহিরূহ তিনি রোপন করেছেন সেখানেও।

আমাদের পূর্বসূরীরা কারবালার শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও ঈমানী চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন সেই পথ ধরে। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে আমাদেরকেও কারবালার মূল শিক্ষা ও পয়গামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার আলো ঘুমন্ত মুসলমানদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেন প্রতিটি মুসলিম পরিবার একটি 'ঈমানী দূর্গ' হিসেবে পরিণত হয়। এটাই হবে শুহাদায়ে কারবালার সঠিক মূল্যায়ন। তাতেই তাঁদের আত্মা পাবে শান্তি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে কারবালার মর্মবাণী উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুণ এবং সীরাতে-মুস্তাকীমের উপর মজবুত থেকে আজীবন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার জন্য কবূল করুন।

কারবালার ডাক

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সেদিন কারবালার ময়দানে আহলে বাইতসহ শাহাদাত বরণ করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। আগত মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁদের এই দৃষ্টান্ত একটি অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে আম্লান থাকবে চিরকাল। এ আদর্শকে আকড়ে ধরে বাতিলের বিরুদ্ধে জীবনবাজী রেখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পাড়াই হবে আজকের মুসলমানদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাই হবে কারবালার আহ্বানে সাড়া দেয়ার সঠিক পন্থা। প্রতি বছর আমাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন গড়ার ডাক দিয়ে যায় কারবালার হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কারবালার ময়দানে আপোসহীন জিহাদের অর্থ এই নয় যে, আমরা মুহররম মাস আসলেই মাতম-মর্সিয়া, বিলাপ, তাজিয়া, আহাজারি, রুনাজারি করে তাঁর প্রতি দুঃখ-সমবেদনা প্রকাশ করব । হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তো সেদিন মুসলিম উম্মাহ'কে ত্যাগ ও কুরবানীর শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অন্য কিছু নয়।

তাই আজ আমাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সীমাহীন। নিজেদের সব কিছু কুরবানীর মাধ্যমে সাড়া দিতে হবে শতস্ফূর্তভাবে কারবালার ডাকের। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে 'কারবালা বাহিনী'। ফেদায়ে কারবালার (কারবালার আদর্শ বাস্তবায়নে নিবেদিত সৈনিক) পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে সমাজের সর্বস্তরে। বাংলার ঘরে ঘরে 'কারবালা বাহিনী'র দূর্গ গড়ে তুলে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জেহাদী জয্বা সৃষ্টি করতে হবে প্রতিটি মুসলমানের অন্তররাজ্যে।

অন্ধকারের কুহেলিকা থেকে জাতিকে সঠিক মুক্তির দ্বারে পৌঁছাতে পারলেই সফল হবে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আপোসহীন সংগ্রাম। শান্তি পাবে শুহাদায়ে কারবালার জীবন্ত আত্মা। আজকের মুসলমাদের জন্য কারবালা এ আহ্বানই করে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কারবালার ডাকে সর্বান্তকরণে সাড়া দেয়ার তাওফীক দিন।

আমার দেখা কারবালা

১৯৮৩ সালে ইরান-ইরাকের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধকল্পে 'শান্তি মিশন' নিয়ে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) যখন মধ্যপ্রাচ্যে ছুটাছুটি করছিলেন এক অনন্য ব্যকুলতা নিয়ে। তখন সৌভাগ্যবশতঃ আমারও তাঁর সফর সঙ্গী হওয়ার নসীব ঘটে যায়। ইরান সফর শেষে সৌদিতে গিয়ে হজ্জব্রত পালনের পর আমরা যখন ইরাকের মাটিতে পা রাখি, তখন অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন সুযোগ এসে যায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মাযার যিয়ারতের। কে ছাড়ে এমন সুবর্ণ সুযোগ!

দশই অক্টোবর আমাদের জন্য সেই সৌভাগ্যের দুয়ার উন্মোচিত হল। আমরা পা রাখলাম করবালার পথে। খোলামেলা, প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন পথের

দুপাশে দৃষ্টি সীমায় শুধু বালুকাময় বিজন মরুভূমির মায়া-মরিচিকার হাতছানি আমাদের চোখগুলোকে বার বার আকর্ষণ করছিল। কখনো-সখনো হঠাৎ ভ্রমনরত দু' একটি উটের কাফেলা দেখে আমরা হারিয়ে যাচ্ছিলাম কয়েক শতাব্দী পূর্বের সেই দিনগুলোতে। কিতাবে পড়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো আমাদের চোখে ভাসতে থাকে। এখন তো কারবালা একটি জনবহুল, ব্যস্ত শহরের নাম। যার জাঁক-জমক পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দিতে চায়। এখানে এসে এখন কারো মাথায় এমন চিন্তা ঠাঁই পাবে না যে, এই শহরটিই এক কালে ছিল একটি ধু-ধু মরুভূমি। যেখানে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও তাঁর সাথীদের তাজা রক্তে উত্তপ্ত বালুকণা একদিন ভিজে উঠেছিল এবং শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু 'নজফ' থেকে কারবালা পর্যন্ত পথে বালু আর কংকরের আধিপত্য দেখে এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এখানকার মাটি মুসাফিরদের কত ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে পারে।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)সহ আমরা গাড়ীতে করে যাচ্ছিলাম। এক স্থানে এসে ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কসতেই আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। ড্রাইভার বলল– 'এটাই কারবালার ময়দান, যেখানে ইয়াযীদ বাহিনী বড় নির্মমভাবে শহীদ করে ছিল হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ তাঁর সাথী সঙ্গীদের।'

আমরা সকলে জুতা হাতে নিয়ে পায়ে হেটে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের চলার গতি মন্থর হয়ে এল। চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল বার বার ইতিহাসের সেইসব রক্তাক্ত পৃষ্ঠাগুলো। একটি অমর শোকাবহ ও সতেজ ইতিহাসের বাস্তব পিঠস্থানে হাজির হওয়ায় মনটা চলে গেল সুদূর অতীতে।

সে কী এক করুণ দৃশ্য। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এক ফোটা পানির জন্য নিষ্ঠুর ইয়াযীদ বাহিনীর কাছে কতই না কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। নিষ্পাপ শিশু-সন্তানদের জীবনটাকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের কাছে। অন্যকিছু নয়, ফোরাতের

অসীম জলরাশি থেকে সামান্য পরিমাণ পানি আনতে দেয়ার সুযোগ চেয়েছিলেন। কিন্তু বাতিলের ঔদ্ধত্য ও জিঘাংসা মানবিক সেই প্রয়োজনের মুখেও, বেদনা ও কাতরতার সেই দুর্বিনীত সময়েও কোন রকম ছাড় দেয়নি। সত্যের প্রশ্নে অবিচল, খেলাফতের আমানত রক্ষার স্বার্থে দৃঢ়পদ এক যুগান্তকারী নকীব হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে শহীদ করেছে তারা নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায়। তাঁর শিশু-সন্তানদের বুকে পিঠে গলায় বিঁধিয়েছে তারা পাশবিকতার অজস্র তীর। তাঁর সঙ্গী-সাথী, সমর্থকদের বধ করেছে আকাশ-ভাঙ্গা এক ভয়াবহ নির্মমতায়।

এই ময়দানে শাহাদাত বরণের মধ্যদিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পরবর্তী যুগের ইয়াযীদ বাহিনীকে হুঁশিয়ার করে গেছেন যে, তাগুতি শক্তি সংখ্যার দিক থেকে যত শক্তিশালীই হোক, সাময়িক ক্ষমতার জোড়ে বাতিল যত আস্ফালনই করুক, সংখ্যালঘু নিরস্ত্র 'হক শক্তি'র হাতে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই পরাজয় ইতিহাসের ভাষায় হয় ঘৃণিত অধ্যায়। সময় সাপেক্ষে সেই পরাজয় সর্বকালেই কারো সমবেদনা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

আমরা মন্থর গতিতে মাযারের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। মাযারে পৌঁছে আমরা ফাতেহা শরীফ পাঠ করে মুনাজাত করি। সেখানে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর অবস্থা ছিল বর্ণনাতীত। যা শুধু অবলোকন করা যায়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। কলমের আঁচড়ে বা ভাষার পাণ্ডিত্বে তা ফুটিয়ে তোলা যায় না। মাযার যিয়ারতের সময় তাঁর দু' চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল, যিয়ারত শেষে তিনি আল্লাহ'র দরবারে যে মুনাজাত করেন, মুনাজাতের সেই সকরুণ ভাব জাগরণী আহাজারি আজও আমার কানে গুঞ্জরণ তুলছে। তাঁর মুনাজাতের ভাষা ছিল—

'হে রাব্বুল আলামীন! তোমার প্রিয় নবীর কলিজার টুকরা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ ময়দানে দ্বীনের জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তোমার পিয়ারা নবীর উম্মত হিসেবে, হুসাইনী আদর্শের

পতাকা নিয়ে আমরাও বাংলার যমীনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছি এবং তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রভু হে! হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাংখিত খেলাফতকে তুমি বাংলার যমীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের দেশীয় ইয়াযীদী শাসকদের স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার হুসাইনী জয্বা তুমি আমাদের দান কর।'

(আজ হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) আমাদের মাঝে নেই। আছে তাঁর রেখে যাওয়া অগণিত হুসাইনী সৈনিক। তাদের কাঁধে বর্তিয়েছে বিরাট দায়িত্ব। তাদেরকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে হুযূরের এই অসম্পূর্ণ কাজটিকে। হযরতের অন্তরের আকাঙক্ষাকে বাংলার যমীনে বাস্তবে রূপদানের সার্বিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে তাদেরকেই।)

মুনাজাত শেষে মাযারের খাদেম আমাদেরকে আরও সামনে চর্তুদিক দেয়ালে পরিবেষ্টিত একটি স্থানের কাছে নিয়ে গেল। জায়গাটি দেখে মনে হল, এইমাত্র এখানে কাউকে হত্যা করা হয়েছে। যার তাজা রক্তের স্রোত এখনো প্রবাহিত হচ্ছে। খাদেমকে প্রশ্ন করে জানতে পেলাম, এটিই হল সেই স্থান, যেখানে যালিম ইয়াযীদ বাহিনী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে শাহীদ করেছিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সেই স্মৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

খাদেমকে প্রশ্ন করলাম– 'ইতিহাসের সঠিক বর্ণনায় আমরা এতটুকুই জানতে পারি যে,হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র লাশকে ছিন্নভিন্ন করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল ইয়াযীদ বাহিনী। তাই যদি সত্যি হয়, তবে এখানে তাঁর মাযার হল কি করে?'

উত্তরে খাদেম বললেন– 'কারবালার ময়দান থেকে হযরত হুসইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র টুকরা হাড্ডি এবং গোশতগুলো একত্রিত করে এখানে তা দাফন করা হয়েছিল। তার উপরই মাযারের অবস্থান।'

সেদিন যদি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ঝুঁকি না নিয়ে ইয়াযীদের প্রস্তাব গ্রহণ করে আপোস মীমাংসার পথ বেছে নিতেন। বজ্র কঠিন

পদক্ষেপের পথ এড়িয়ে তিনি যদি সামান্যতম নমনীয় ভাব প্রদর্শন করতেন। তবে হয়ত ইয়াযীদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে তার মাথায় স্থান দিতে কসূর করত না এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'রও ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কোন অভাব হত না। কিন্তু তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস, মায়া-মমতা পরিত্যাগ করে অনন্ত জীবনের শান্তি-সুখের প্রত্যাশায় এবং অনাগত প্রজন্মের সামনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক প্রদর্শিত সত্যের পথে সুদৃঢ় থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কারবালার সঠিক মর্মবাণী উপলব্ধি করার তাওফীক দিন। আদ্‌ল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুমহান আদর্শের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আমাদের কর্মজীবনে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটান। আমীন।

আশুরা সম্পর্কিত মাসায়েল ঃ

মুহররম মাস আসলেই শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ সব জান্তার ভাব জাহির করতে অভ্যস্ত এক শ্রেণীর লোকদের মাঝে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। এ মাসের দশ তারিখ অর্থাৎ আশুরা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতে থাকে তাদের কার্য ব্যস্ততা। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র শাহাদাতকে কেন্দ্র করে এই সময় বেশ ঘটা করে বিচিত্রসব অনুষ্ঠানমালা পালনের মাধ্যমে দিনটিকে তারা উদ্‌যাপন করে থাকে। তাই এ সম্পর্কিত ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানগুলো পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরা হল—

আশুরার নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ঃ

'মুহররমের দশ তারিখে তাজিয়া, পতাকা, দুলদুল কবর ইত্যাদির আকৃতি বানানো, সাজসজ্জা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা, গোস্ত জাতীয় খাবার থেকে বিরত থাকা, সব সময় বিষণ্ন থাকা, তাজিয়া বানানোর কাজে অংশ গ্রহণ, উৎসাহ প্রদান করা, সেই কাজে ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র দেয়া, অর্থকড়ি দিয়ে সাহায্য করা, বুক চাপড়ানো, মর্সিয়া করা, কারবালার শাহাদাতের কাহিনী পড়া, পুঁথি পাঠ করা, আহাজারি করা, তাজিয়া, দুলদুল ইত্যাদির সামনে যে সব নযর-নিয়াজ রাখা হয়, যে নারিকেল ভাঙ্গা হয়, আশুরার রাতে যে হালুয়া তাজিয়ার সামনে পেশ করা হয়, পুণ্য ও বরকত মনে করে তা খাওয়া এবং বন্টন করা, আশুরার রাতে তাজিয়া, দুলদুল, পতাকা ইত্যাদি নিয়ে প্রদক্ষিণ করা, গান-বাজনাসহ তা প্রদর্শন করা, আশুরার সকালে তাজিয়া, দুলদুল, পতাকা ইত্যাদি নিয়ে জাঁকজমকের সাথে মিছিল করা, সাথে যাওয়া এবং সে গুলোকে দাফন করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 'বিদ্‌আতে সাইয়্যিয়াহ।' তার মাঝে কিছু কিছু এমন কাজও রয়েছে যে গুলো হারামের অর্ন্তভুক্ত। আঁর কিছু তো শির্কের সম্ভবনাও রাখে। অতএব এ সকল কর্মকান্ড পরিত্যাগ করা ওয়াজিব।

অবশ্য কারবালার ঘটনা এবং আহলে বাইতের শাহাদতকে স্মরণ করে দুঃখিত, ব্যথিত হওয়া ঈমানেরই অংশ। তবে তাকে শুধুমাত্র মুহররমের দশ

তারিখের মাঝে সীমাবদ্ধ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতারই শামিল। এ তো এমন এক মর্মস্পর্ষী ঘটনা যা মুসলমানদের অন্তরে সার্বক্ষণিক জাগ্রত থাকবে।'(১)

'তাজিয়া বানানো যে নাজায়েজ এবং দ্বীন ও ঈমান বিরোধী তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। একজন সাধারণ মুসলমানের সামনেও এ কথার দলীল পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে–'তোমরা কি এমন জিনিষের উপাসনা করছ, যাকে তোমরা নিজেরাই বানিয়েছ?'

বলা বাহুল্য যে, মানুষই নিজের হাতে বাঁশ কেটে তাজিয়া তৈরী করে, আবার তার নামে মান্নত মানে, তার কাছে প্রার্থনা করে, সন্তান-সন্ততি ও স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করে, তার যিয়ারতকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র যিয়ারত মনে করে, এসকল কাজ কি ঈমানের সারমর্ম এবং ইসলামী শিক্ষার সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক নয়?' (২)

'কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন যে তাজিয়া তো একটি আকৃতি। যদি বায়তুল্লাহ শরীফ, মদীনা মুনাওয়ারা, রওযায়ে আতহার, বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদির ফটো তোলা বা রাখা জায়েজ হয়, তবে কেন তাজিয়া বানানো জায়েজ হবে না?

তাদের এই প্রশ্নের উত্তর হল— 'নিষ্প্রাণ ফটো, নকশা ইত্যাদি তোলা এবং রাখা তখনই জায়েজ হয়, যখন তার দ্বারা কোন ইবাদাত-বন্দেগী এবং সম্মানের উদ্দেশ্য না হয়। কাবা শরীফ ইত্যাদির ফটো-নকশা তো ইবাদাত বন্দেগীর জন্য রাখা হয় না, এগুলোর তাওয়াফও করা হয় না। এগুলোর উদ্দেশ্যে কেহ মান্নত বা নযর-নিয়াজও করে না। এমন কি আসল কাবার ন্যায় এগুলোর সম্মানও করা হয় না। অথচ তাজিয়ার মিছিল ও তাজিয়া বানানোর মাঝে আকীদা এবং বিশ্বাসগত চূড়ান্ত বিভ্রান্তি রয়েছে। কেননা তাজিয়ার সম্মানে সিজদা করা হয়, তাকে প্রদক্ষিণ করা হয়, বিভিন্ন ধরনের উপহার-উপঢৌকন পেশ করা হয়, তার নামে মান্নত মানা হয়, তার কাছে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের আরজি পেশ করা হয়। এজন্য তাজিয়া বানানো এবং তা ঘরের ভিতর টানানো নাজায়েজ। যদি বায়তুল্লাহর ফটোর সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হয়, তাহলে তাও নাজায়েজ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।' (৩)

---

(১) ইমদাদুল মুফতিয়ীন, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫৯-৬০
(২) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া , খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২৭৪-২৭৫
(৩) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া - খন্ড : ২, পৃষ্ঠা - ২৭৬-২৭৭

শিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস ঃ

'শিয়া সম্প্রদায় মুহররম মাসকে অমঙ্গলের মাস মনে করে। তাদের মতে 'শাহাদাত' অত্যন্ত খারাপ জিনিস এবং অমঙ্গলের বিষয়। যেহেতু হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ মাসেই শহীদ হয়েছিলেন, এ জন্য মুহররম মাসে শিয়ারা কোন আনন্দোৎসব, খুশীর কাজ, বিবাহ-শাদী ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। মুসলমানদের আক্বীদা শিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের দৃষ্টিতে এ মাস সম্মানীত এবং ফযীলতপূর্ণ। মুহররম শব্দের অর্থই সম্মানীত, মর্যাদা সম্পন্ন এবং পবিত্র।' (১)

মুহররম মাসে ইছালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে খাওয়ার আয়োজন করা ঃ

'মুহররম মাসে বিশেষ করে নয়, দশ এবং এগার তারিখে খানা পাকিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আত্মার উদ্দেশ্যে ইছালে ছওয়াব করা হয়, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারনা। ইছালে ছওয়াবের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হল, নিজের সাধ্যানুযায়ী নগদ টাকা পয়সা কোন উত্তম কাজে লাগিয়ে দেয়া বা কোন ফকির-মিসকীনকে দান করে দেয়া। কারণ পয়সার মাধ্যমে গরীব-মিসকীন স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়, এবং টাকা পয়সা যদি গরীবের ঐ দিন প্রয়োজন না হয়, তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সে তা রেখে দিয়ে তার প্রয়োজন মিটাতে পারে। তাছাড়া এতে রিয়া বা লোক দেখানো থেকেও মুক্ত থাকা যায়। যখন একথা প্রমাণিত হল যে, মুহররম মাস এবং আশুরার দিনটি ফযীলতপূর্ণ, তাই এ মাসে অধিক পরিমাণে নেক কাজ করা উচিত। সুতরাং এ মাসে বিবাহ-শাদী আনন্দোৎসবে অংশ গ্রহণ কোন অশুভ কাজ নয়। বরং এ মাসে বিবাহ-শাদীতে বরকত রয়েছে।'

নিম্নে ইছালে ছওয়াবের ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির দোষনীয় দু'য়েকটি দিক তুলে ধরা হল —

(১) যে সমস্ত আত্মার জন্য ইছালে ছওয়াব করা হয়ে থাকে, যদি ইছালে ছওয়াবের মাধ্যমে ঐ আত্মার কাছে লাভ লোকসানের আশা করা হয়, তবে তা শির্কের অর্ন্তভুক্ত হবে।

(২) সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, যে জিনিসটি সদক্বা হিসাবে প্রদান করা হয়, মৃতব্যক্তি হুবহু ঐ জিনিসটিই পেয়ে থাকে। এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং মিথ্যা। মৃতব্যক্তি ঐ জিনিসটি প্রাপ্ত হয় না বরং এর ছওয়াব পেয়ে থাকে।

(১) আহসানুল ফাতাওয়া, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৮৯

(৩) ইছালে ছওয়াবের সময় নিজের পক্ষ থেকে কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, যেমন — নির্দিষ্ট মাস, দিন, খাদ্য ইত্যাদি; অথচ শরীয়ত এ সকল বিষয় নির্দিষ্ট করেনি। যখন যা ইচ্ছা তখন তা দান করার অনুমতি রয়েছে। শরীয়তের দেয়া স্বাধীনতাকে নিজের পক্ষ থেকে শর্তযুক্ত করা শক্ত গোনাহ এবং বিদআত। বরং তা শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ।' (১)

ইসলামে শোক পালনের বিধান ঃ

মুহররম মাসকে মাতম এবং শোকের মাস মনে করা নাজায়েজ এবং হারাম। হাদীস শরীফে মহিলাদের তার আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে তিনদিন শোক পালন করার অনুমতি দিয়েছে। আর নিজের স্বামীর ইন্তেকালে শোক পালন করার বিধান দিয়েছে চারমাস দশদিন। অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন বৈধ নেই। বরং তা করা হারাম। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা হল —

'যে নারী আল্লাহ তায়ালা এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী, তার জন্য জায়েজ নেই যে, কারও মৃত্যুতে তিন রাতের বেশী শোক পালন করে। কিন্তু স্বামীরা এই নির্দেশের অর্ন্তভুক্ত নয়। কেননা তাদের বেলায় শোক পালন করতে হবে চারমাস দশদিন।' (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)

মুহররম মাসে বিবাহ-শাদীকে অশুভ মনে করা শক্ত গুনাহ এবং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-এর আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ইসলাম যে সব বিষয়কে হালাল এবং জায়েজ আখ্যা দিয়েছে, বিশ্বাস এবং কার্যক্ষেত্রে সে সব বিষয়কে নাজায়েজ এবং হারাম মনে করলে ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। মুসলমানদের উচিত, শিয়া সম্প্রদায় এবং রাফেজীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা।' (২)

আশুরা সম্পর্কে মনিষীদের অভিমত ঃ

বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) আশুরা সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন —

'হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের দিনটিকে যদি মাতম বা শোক দিবসের জন্য এতই গুরুত্ব দেয়া হত, তবে সোমবার দিনটিকে আরও ঘটা করে শোক দিবস হিসেবে পালন করা অধিক বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ, এ

---

(১) আহসানুল ফাতাওয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা - ৩৯১-৩৯২

(২) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯১

দিনে রাসূলে আরাবী, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' সব ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালার দিদারে চলে গিয়েছেন। এই দিনেই নবীর পর শ্রেষ্ঠমানব প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।' [অথচ আমাদের সমাজে সোমবারকে শোক দিবস হিসেবে পালন করার নিয়ম তো আজ পর্যন্ত চালু হয়নি। তাহলে কোন যুক্তির আশ্রয় নিয়ে ঐ শ্রেণীর লোকেরা হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র শাহাদত নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে? তা আমাদের বোধগম্য নয়।] (গুনিয়াতুত্ তালেবীন, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৩৮)

'মুসলিম সমাজে এ ধরণের কু-প্রথা চালু হওয়ার আশংকা করেই বহু পূর্বে আল্লামা ইবনে হযর মক্কী (রহঃ) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে ছিলেন— 'হুশিয়ার!! আশুরার দিনে তোমরা রাফেজীদের বিদআতে জড়িয়ে যেও না। মাতম করা, উহ্-আহ্ করে চিৎকার করা, কিংবা শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হওয়া তো মুসলমানের ঐতিহ্য নয়। এমন যদি হত, তবে তো খোদ রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-এর মৃত্যু দিবসে এই কর্মকান্ডকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হত।' (সাওয়ায়েকে মুহ্‌রিকা, পৃষ্ঠা - ১১২)

এ সম্পর্কে আল্লামা রূমী (রহঃ) অভিমত ব্যক্ত করে বলেন— 'হযরত হুসাইন ইবনে আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের কারণে রাফেজীদের মত এ দিনটিকে মাতমের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া, বস্তুত: দুনিয়ায় নিজেদের পুণ্যময় সকল কাজের বিনাশ করারই নামান্তর হবে। তা ছাড়া আর কিই বা আশা করা যায়? অথচ এ কাজের কর্তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে গর্বে বুক উচিয়ে চলে। মানুষের কাছে এ কাজের ফিরিস্তি গেয়ে তারা সীমাহীন সুখ অনুভব করে। কিন্তু তারা কি একটি বারের তরে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না যে, খোদ আল্লাহ তায়ালা কিংবা তার রাসূল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কোন নবী রাসূলের মহা বিপদের দিন বা মৃত্যুর দিন হিসেবে মাতম বা শোক পালনের নির্দেশ কখনো কাউকে দেননি।'(১) (মাজালিসে আবরার, পৃষ্ঠা-২৩৯।)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) অভিমত ব্যক্ত করে বলেন— 'মুহররমের দশ তারিখ পবিত্র কুরআনকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা এবং তা মাথায় চড়িয়ে অলিতে গলিতে প্রদর্শন

---

(১) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪১-৩৪২

করা, তার নিচে গিয়ে মাথা লাগানো, চুমা খাওয়া, ঘটা করে ডাকঢোল পেটানো এবং এগুলোকে বড় পুণ্যের কাজ মনে করা; শরীয়তে এর কোন সনদ নেই। এ গুলো একেবারেই ভিত্তিহীন কাজ। এর দ্বারা সাওয়াবের আশা করা একেবারে বৃথা।' (১)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন — 'অনেক নির্বোধ বোকা টাইপের মানুষ মুহররমের দশ তারিখে বিবাহ-শাদী, সুন্নাতে খাৎনা এবং অন্যান্য আনন্দোৎসব বর্জন করে থাকে, অথচ শরীয়তে এ সব কিছু জায়েজ আছে। না জায়েজ হওয়ার পক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। বাকী শুহাদায়ে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা মুসলমানের অন্তরকে সবসময় ব্যথিত করবে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধুমাত্র দশই মুহররমকে শোকের জন্য বেছে নেয়া বোকামী বৈ কিছু নয়। ইসলামী শরীয়তে শোক পালনের জন্য বিধিবদ্ধ যে নিয়ম করে দিয়েছে, শোক পালনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাই বৈধ পন্থা মনে করতে হবে। অন্য সব কিছু নাজায়েজ মনে করতে হবে ।

অতএব বিবাহ-শাদী, অলিমা, সুন্নাতে খাৎনা, সব রকমের বৈধ আনন্দোৎসব মুহররম মাসে বিশেষতঃ দশই মুহররম জায়েজ আছে।' (২)

সমাপ্ত

(১) ইমমদাদুল ফাতাওয়া, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ৩৪৮, পরিশিষ্ট ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২০

(২) ইমদাদুল মুফতিয়ীন, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা - ৯৬
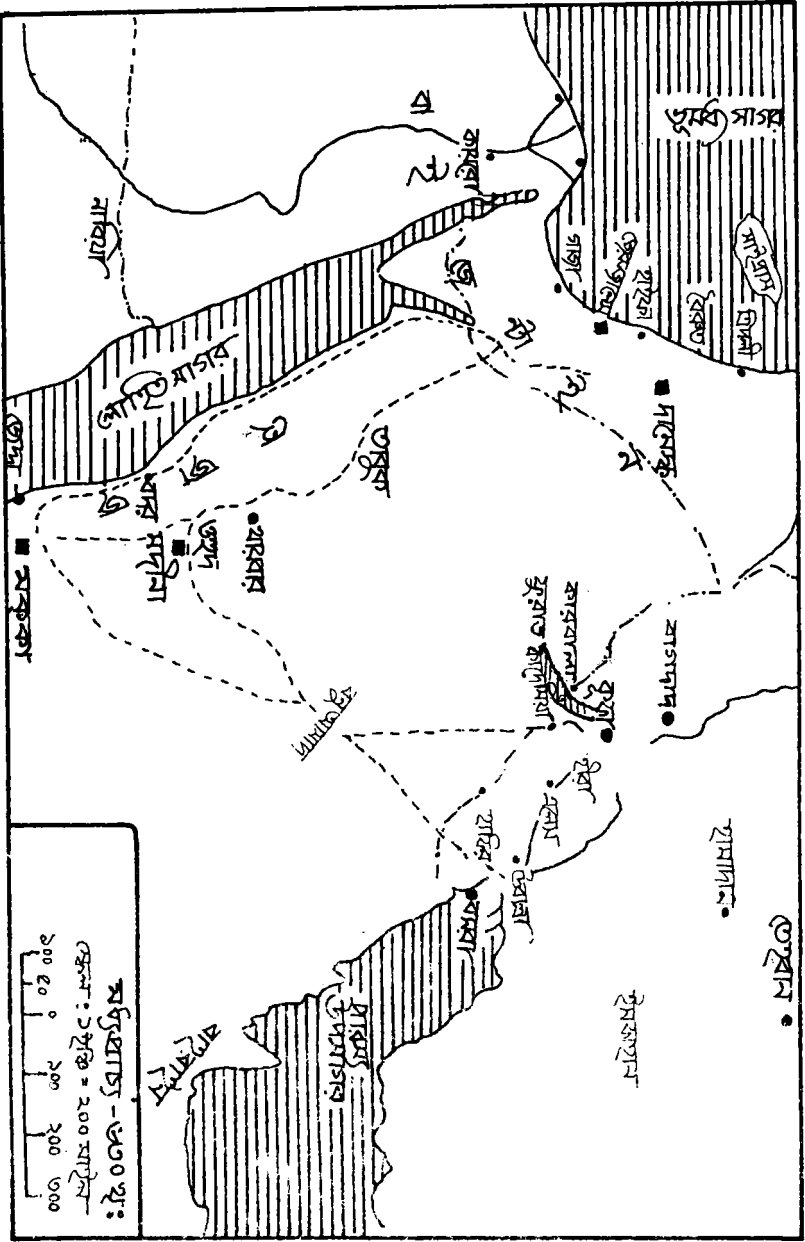
মধ্যপ্রাচ্য-৬৩০ খৃঃ
স্কেল : ১ ইঞ্চি = ২০০ মাইল
১০০ ৫০ ০ ১০০ ২০০ ৩০০
ভূমধ্য সাগর
সাইপ্রাস
ত্রিপলী
বৈরুত
হাইফা
জেরুসালেম
গাজা
দামেস্ক
কায়রো
নাবিয়া
তাবুক
খায়বার
ওহুদ
বদর
মদীনা
জেদ্দা
মক্কা
লোহিত সাগর
বাগদাদ
কুফা
কারবালা
ফুরাত
কাদেসিয়া
হীরা
হাফির
বসরা
বনু আসাদ
পারস্য উপসাগর
বাহরাইন
তেহরান
হামাদান
ইসফাহান

মুফতী ফজলুল হক আমিনী
ব্যক্তি পরিচিতি

১৯৪৫ ইংরেজী সনের ১৫ই নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আমীন পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুফতী ফজলুল হক আমিনীর জন্ম। পিতা আলহাজ্ব মরহুম ওয়ায়েজ উদ্দীন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামেয়া ইউনুসিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মুফতী আমিনী মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন বিক্রমপুরের মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসায় তিন বৎসর পড়াশুনা করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬১ ইংরেজী সনে রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লালবাগ জামেয়ায় চলে আসেন। এখানে তিনি হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ও হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস তথা টাইটেলের সনদ লাভ করেন। ১৯৬৯ ইংরেজী সনে আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহঃ)-এর কাছে হাদীস ও ফেকাহর উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান করাচী নিউ টাউন মাদ্রাসায় গমন করেন। এখানে তিনি ইসলামী শিক্ষার উপর বিশেষ ডিগ্রী অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭০ ইংরেজী সনে মাদ্রাসা-ই- নূরিয়া কামরাঙ্গীরচরের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে দ্বীনি খেদমত শুরু করেন। এই বছরই তিনি হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭২ ইংরেজী সনে মাত্র নয় মাসে তিনি সম্পূর্ণ কালামে পাক হেফজ করেন। এ সময় তিনি কিছু দিনের জন্য ঢাকার আলু বাজারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে আলু বাজার মসজিদের খতীবের দায়িত্ব ও পালন করেন।

১৯৭৫ ইংরেজী সনে তিনি জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার উস্তাদ ও সহকারী মুফতী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ ইংরেজী সনে তিনি লালবাগ জামেয়ার ভাইস-প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ ইংরেজী সনে হাফেজ্জী হযূর (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীসের মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

মুফতী আমিনী হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর 'মাজাযে সুহবত' এবং পরবর্তীতে তাকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল কবীর সাহেবসহ হাফেজ্জী হুযূরের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা বাইয়াত করার অনুমতি প্রদান করেন।

রাজনীতিতে রয়েছে মুফতী আমিনীর সরব পদচারণা। ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলন গঠিত হলে তিনি মনোনীত হন এ সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল। হাফেজ্জী হুযূরের ইন্তেকালের পর তিনি দেশে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃ পুরুষের ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাবরী মসজিদ লংমার্চসহ নাস্তিক- মুরতাদ বিরোধী সকল আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। বর্তমানে তিনি উলামা কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব।

বেশ কয়েকবার হজ্ব-ওমরা পালনসহ তিনি লন্ডন, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তান সফর করেছেন। ইরান, ইরাক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধে ১৯৮৪ ইংরেজী সনে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।